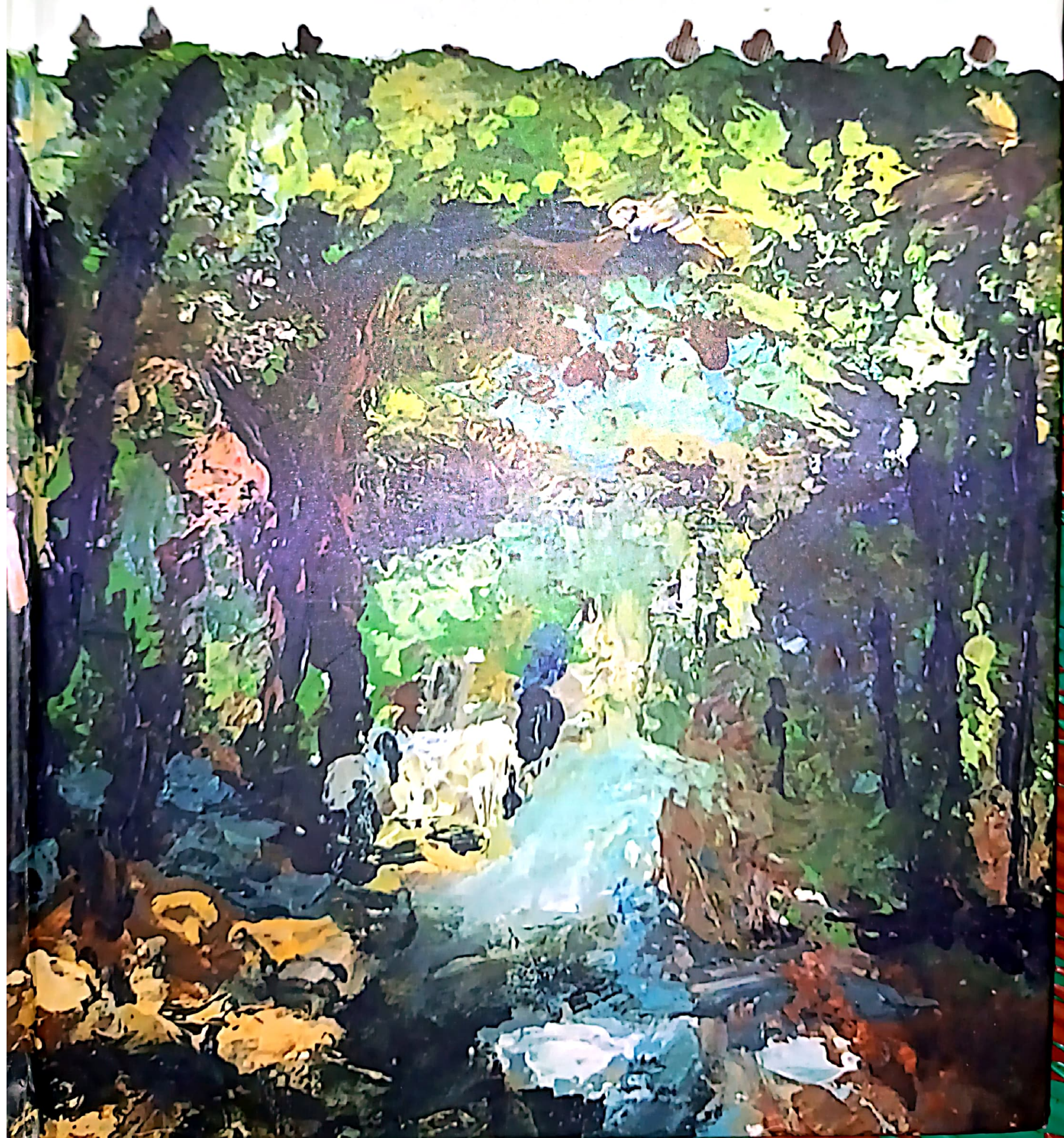
কুড়মালি

ভাষা ও সংস্কৃতি

সুস্নাত জানা



কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির দুই ব্যক্তিত্ব

দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো
ও
ভরত মাহাতো

পূর্বকথা

দীর্ঘকাল ধরে ছোটনাগপুর সংলগ্ন অরণ্যময় জঙ্গালমহলে বসবাসকারী আদিবাসীদের একটি জাতি কুর্মি বা কুড়মি/মাহাত সম্প্রদায়। একসময় সমস্ত আদিবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে একই ধরনের সমাজরীতির মধ্যে সমন্বয়ী একতা নিয়ে বসবাস করতেন। ইংরেজ শাসনকালে এই আদিবাসী শক্তির একত্রিত আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে প্রথমে জঙ্গলমহল জেলা, পরে জঙ্গলমহল ভেঙে মানভূম জেলা করে বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীদের বারবার বিভক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। উত্তরকালে মানভূম জেলার অবলুপ্তি ঘটিয়ে অরণ্যবাসী এই সংগঠিত আদি সম্প্রদায়গুলিকে নানা ভৌগোলিক ভাগে ভেঙে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। জঙ্গলমহলের অখণ্ডত্ব এভাবেই বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিহার ভেঙে আবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠে। এই বিভাজনে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতোই কুর্মি সম্প্রদায়ও বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু নতুন গড়ে ওঠা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রধান সম্প্রদায় কুর্মি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাধীন ভারতে নানা ভাবে বঞ্চিত। জীবনচর্যা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে কুর্মি বা কুড়মিরা অরণ্যাঞ্চলে বসবাসী অন্যান্য আদিবাসীদের মতো হলেও স্বাধীন ভারতে তাঁরা আজও তপসিলী জাতি, উপজাতির কোনও স্বীকৃতিই পায়নি। বরং আদিবাসীদের অখণ্ড ঐক্যে বিচ্ছিন্নতা আনার জন্য কুর্মি বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

কুর্মি বা কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ অনেকখানি এগিয়ে। এই এগিয়ে থাকার অর্থ আধুনিক আর্যসংস্কৃতির আত্মীকরণে তাঁরা অগ্রণী। যদিও আজকের দিনে সব আদিবাসী সম্প্রদায়ই চেষ্টা করছেন এই অগ্রণী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে। ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে সমস্ত অরণ্যময় কুর্মিদের মধ্যে যে ঐক্য, তারই প্রকাশ কুড়মালি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, লিপিভাবনায়।

RUSA 2.0 Component 8 Scheme-র অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুর কলেজের গবেষণা প্রকল্পে আমি 'কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয়ে অনুসন্ধানে অগ্রসর হই। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কেশিয়াড়ী, ওড়িশা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে এবং মঙ্গল মাহাত, ভরত মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ মাহাত, ছাত্র সাগর মাহাত, আমার সহকর্মী অধ্যাপক ফটিকচাঁদ ঘোষ প্রমুখ অসংখ্য মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ডিন, বর্তমান মেদিনীপুর কলেজের সম্মাননীয় অতিথি অধ্যাপক ড. শঙ্করপ্রসাদ সিং এ বিষয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. গোপালচন্দ্র বেরার একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতায় স্নেহস্পর্শে আমার এ গবেষণা সম্ভব হল। শ্রী ভগবান দাস মাহাত, ভরত মাহাত, ঝাড়গ্রামের মঙ্গল মাহাত-র অত্যন্ত আন্তরিক সহযোগিতা স্নেহস্পর্শে কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি এবং কুড়মালি লিপির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতর এই বিষয়ক গ্রন্থ আমার কাছে প্রেরণা। ১৫ এপ্রিল ২০১৮-তে বন্ধু ড. ফটিকচাঁদ ঘোষের আহ্বানে ঝাড়গ্রামে একটি সাহিত্যসভায় ভবতোষ শতপথী স্মারক বক্তৃতায় প্রথম কুড়মালি ভাষা নিয়ে বক্তব্য রাখি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাত— তাঁরা দুজনেই স্বর্গগত, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। আর উপস্থিত ছিলেন কবিবন্ধু বেবী সাউ। এই সভাটিকে আমার এই গবেষণার সূতিকাগার হিসেবে উল্লেখ করি। বর্তমানে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য আমার মা রেণুকা জানা ৮৪ বছর বয়সে, স্ত্রী ললিতা ও কন্যা সৌবর্ণা এবং প্রচ্ছদশিল্পী পুত্র সুশ্রুতর নিরন্তর সহায়তা আমাকে উৎসাহ যোগিয়েছে। মেদিনীপুর ডট ইন-এর কর্ণধার অরিন্দম ভৌমিক গ্রন্থ প্রকাশের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন— এঁদের কাছে

আমি কৃতজ্ঞ। কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে প্রথমে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমানে ঝাড়খণ্ড ও বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। আমরা মেদিনীপুর কলেজেও বাংলা বিভাগে কুড়মালি কবিতা ও সংস্কৃতি নিয়ে পাঠদান শুরু করেছি। আগামী দিনে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা হবে আশা করছি। এখন এই বইয়ের পাঠকরা এখান থেকে নতুন কোনও অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা পেলে আমি অনুপ্রাণিত হব।

সুস্নাত জানা

বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর কলেজ
ডিসেম্বর, ২০২২

সূচিপত্র

কুর্মি সম্প্রদায়ের আদিবাসী বৈশিষ্ট্য

ভারতে বসবাসকারী জনগণকে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে সম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি, বর্ণ অনুসারে চিহ্নিত করার জন্য বা বিভাজন করার জন্য জনগণনার কাজ শুরু করেন। ভারতীয় সমাজ জীবনে সম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ের বিভাজন করেছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বহু ঐতিহাসিক তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। ১৮৭১-৭২ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর আজ পর্যন্ত এই জনগণনা হয়ে আসছে ব্রিটিশ ভারতে জনগণনায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির প্রদেশ, ডিভিসান, জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানের পাশাপাশি উক্ত সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বীদের জাতিভিত্তিক পরিসংখ্যান জাতিগুলির আর্থসামাজিক অবস্থার পাশাপাশি ধর্মীয় লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান— এ সব জনগণনার রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসিত ভারতের ১৯৩১-এর জনগণনার রিপোর্টকে ভিত্তি করেই স্বাধীনোত্তর ভারতের জনগণনা শুরু হয়েছিল। এই জনগণানায় হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চার বর্ণের বাইরে অনার্য গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়কে কখনো জনজাতি aboriginal Tribe, আদিম জনজাতি Premitive Tribe বহিঃস্থ জাতি exterior Tribe, দলিত সম্প্রদায় depressed classes, অনুন্নত উপজাতি backward Tribe— এরকম নানা নামে উল্লেখিত করা হয়েছে। এর আগে ১৯২১-এর জনগণনায় বাংলায় কুর্মিরা দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিহারের ছোটনাগপুর ডিভিসনের কুর্মি /কুড়মিরা আদিম জনজাতি aboriginal হিসেবেই নথিভূক্ত ছিল। ১৯৩১ সালের জনগণনায় কুর্মিসহ রাজবংশী নুলিয়া ইত্যাদিদের দলিত সম্প্রদায় থেকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু বিহার ছোটনাগপুর ডিভিসানে বসবাসকারী কুর্মি মাহাতোদের আদিম জনজাতি হিসেবে (Premitive Tribes) সেন্সাস রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে সংবিধানে ৩৪২ ধারার দেওয়া ক্ষমতার বলে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্যভিত্তিক যে তপসিলী জাতি ও উপজাতির তালিকা প্রকাশ করেন, তাতে

১৯৩১-এর জনগণনাকে ভিত্তি করা হয়েছিল। ১৯৫০-এ প্রকাশিত রাজ্যভিত্তিক তপসিলী উপজাতিগুলির তালিকায় সর্বমোট ২১২ সম্প্রদায় বা জাতিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। অথচ বাংলা, বিহার বা উড়িষ্যায় বসবাসকারী সর্ববৃহৎ কুর্মিরা এই তপসিলী জাতি বা উপজাতির তালিকার থেকে পরিত্যক্ত হয়।

আদিবাসীরা তাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে বিহার থেকে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড পৃথক রাজ্য হিসেবে গঠিত হয়। এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন আদিম জাতিগুলির সংকীর্ণ পরিসর মুক্ত করে চিরায়ত অভিন্ন আদিবাসী ঐক্যে সম্প্রদায়গুলি কাছাকাছি আসে। ঝাড়খণ্ডের অন্যতম মূল আদিবাসী কুর্মি-মাহাতো, ভূমিজ এই আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করে। নতুন রাজ্য গঠিত হওয়ার পরই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার ২০০৪ সালে নভেম্বর মাসে ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী কুর্মি-কুড়মি (মাহাতো), ঘাটওয়ারসহ কিছু জাতিকে তপসিলী উপজাতির তালিকায় নথিভূক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠায়। লোকসভা সচিবালয়ের স্টান্ডিং কমিটির (Standing Committee on Social Justice and empowerment, Loksabha Secretariat) ২৬ মার্চ, ২০১২-র প্রকাশিত রিপোর্টে কুর্মিদের জাতিসত্তার বিজ্ঞানসম্মত অনুপুঙ্খ (ethnographis details) বিবরণ দাখিল করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন।

২০১৫-র ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বিজনেস স্টান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের থেকে জানা যায় ঝাড়খণ্ডে ওই সময়ে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতার ফলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন— যাতে তপসিলী উপজাতির তালিকায় কুর্মিদের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ক প্রস্তাবটি স্থিতাবস্থায় রাখা হয়। আবার ঝাড়খণ্ডের মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুৎবরণ মাহাতো মহাশয়ের ২০১৭-র ১০ নং বিলে উত্থাপিত তপসিলী উপজাতি তালিকায় কুর্মিদের অন্তর্ভূক্তির প্রসঙ্গটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেখানে তিনি পার্লামেন্টে এই তপসিলী উপজাতি সংশোধনী বিল পেশের সপক্ষে বিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে যুক্তি সঙ্গত বিবরণ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, ঝাড়খণ্ড নিঃসন্দেহে আদবাসী অধ্যুষিত একটি রাজ্য। এবং আদিবাসীদের সর্বাত্মক গণআন্দোলনের ফলেই ঝাড়খণ্ডকে পৃথক রাজ্য হিসবে

গড়ে তুলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের মূল অধিবাসী বিশাল সংখ্যক কুর্মি /কুড়মি মাহাতো সম্প্রদায়ের আদিম জনজাতি এখনও তপসিলী উপজাতির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ফলে এদেশের যাবতীয় সাংবিধানিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তারা দীর্ঘকাল বঞ্চিত। স্বাধীনোত্তর ভারতে কিংবা বিহার থেকে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের আগে পর্যন্ত বিহার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দোদুল্যমানতার জন্যই ছোটনাগপুর সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী কুর্মি /কুড়মিদের তপসিলী উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেল।

ঝাড়খণ্ডে মূল জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ লোক কুর্মি সম্প্রদায়ের। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সমস্ত জেলাসহ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, সুন্দরগড় জেলায় প্রায় দু'কোটির অধিক কুর্মি /কুড়মি সম্প্রদায়ের জনজাতি বাস করে। সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে ঝাড়খণ্ডে কুর্মিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদিম উপজাতির হয়েও ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার কুর্মিরা তপসিলী উপজাতিদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ জীবনচর্যায় সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার আচরণে লোকায়ত জীবনধারায় অন্য সব উপজাতিদের মতো কুর্মিরাও একই। মূলত কুর্মিরা অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী প্রাচীন ও আদিমতম জনজাতি। সমাজজীবন, শিক্ষা ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ভীষণভাবে পিছিয়ে থাকা জনজাতি।

তপসিলী উপজাতি তালিকায় কুর্মীদের অন্তর্ভূক্তির জন্য ঝাড়খণ্ডের মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুৎবরণ মাহাতো সংসদে উত্থাপিত বিলে যে সব কারণগুলি দেখিয়েছেন তা প্রধানত :

১. ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আদিবাসীদের বাসভূমি মূলত বৃহত্তর জঙ্গলমহলে, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম; বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড় ও কেওনঝড় জেলা আদিম উপজাতি বসবাসের অঞ্চল— কুর্মি/কুড়মি মাহাতোরা এই আদিম উপজাতিদের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

২. অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য আদিম জনজাতিগুলির মতোই কুড়মিদের সমাজব্যবস্থা, ভূমিবিন্যাস, উত্তরাধিকার

আইন, সামাজিক, লোকায়ত ও ধর্মীয় জীবনযাপনের ধারা, সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার— সবই আদিবাসীসুলভ।

৩. ঔপনিবেশিক শাসনকালে ছোটনাগপুরের কুর্মিরা সরকারী রেকর্ডে আদিম উপজাতি হিসেবে উল্লিখিত ছিল। ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর প্রজাসত্ত্ব আইনে অন্যান্য উপজাতিদের মতো কুর্মিদেরও জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।

৪. ১৯৫০ ও ৫১ সালে প্রকাশিত তপসিলী উপজাতি তালিকা থেকে কুর্মি/কুড়মি (মাহাতো)-দের কোনও কারণ ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছে।[১]

সংসদে উত্থাপিত এই বিলটি ব্যক্তিগত বিল হিসেবে (Private Member bill) নথিভূক্ত হয়েছে। যদিও এরকম ব্যক্তিগত বিলও অনেকসময় পাশ হয়েছে, যদিও তার সংখ্যা নগন্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০১৮-র ১৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কুর্মিদের তপসিলী উপজাতি অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ পাঠিয়েছেন। রাজ্যসরকারের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কুর্মি মাহাতদের সামাজিক, লোকায়ত ও ধর্মীয় আচার আচরণ তপসিলী উপজাতিগুলির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সাদৃশ্যমূলক। ভারত সরকার ২০১৯-র ২৮ নভেম্বর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সুপারিশমতো কুর্মি সম্প্রদায়ের তপসিলী উপজাতির অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাবটি বিবেচনায় রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে উভয় রাজ্যেই অন্যান্য তপসিলী উপজাতি সংগঠনগুলির বিরোধিতার ফলে রাজ্য সরকার এ ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ভারতের এই অঞ্চলের আদিম উপজাতিগুলির জাতিসত্তা ও সংস্কৃতিগত অভিন্ন ঐক্য ও আঞ্চলিক সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্যই জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। আরও একটি লক্ষ্য ছিল, যাতে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এই জনজাতিগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বাত্মক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না

পারে, এবং প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই বিশাল এলাকার সম্পদ লুণ্ঠনের যাবতীয় বাধাবিপত্তি দূর হয়। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, কিছু স্বার্থান্বেষী ও কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনাও কুর্মিদের অন্যান্য আদিবাসীদের কাছ থেকে আলাদা করেছে।

তথ্যপঞ্জি : Ministry of Parliamentary Affairs- Govt of India, Annual Report ২০১৭-১৮

কুর্মিদের আদি বাসভূমি

আদিবাসীদের মূল বাসভূমি ছিল জঙ্গলমহল। ছোটনাগপুরের মালভুমি ও তার আশপাশের অঞ্চলই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পাহাড় অরণ্য পরিবেষ্টিত রুক্ষ অনুর্বর মালভূমি অঞ্চল। মোগল শাসনকালে এই অঞ্চলকে 'ঝাড়খণ্ড' বলা হত। ইংরেজ প্রশাসক কাউপ্লাণ্ড বলেছেন মোগল শাসনকাল পর্যন্ত ছোটনাগপুর সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত।

To the Mahamadan historian the whole of modern Chotonagpur and the adjoining hill states was known by the name of Jharkhand. (H. Coupland, Bengal District Gazettirs, 1910, Page-52)

শ্রী শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে মত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
মথুরা যাইবার পথে আসেন ঝাড়িখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড।।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র ঝাড়খণ্ডের জনজীবনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাসহ জঙ্গলমহলের অনেক রাজা মহারাজা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৈষ্ণবধর্ম এই অঞ্চলের অগণিত মানুষ গ্রহণ করেছিল এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে।

ব্রিটিশ লেখকগণের উল্লেখ থেকে জানা যায়, জঙ্গলমহলের অধিকাংশ অঞ্চল উড়িষ্যার হিন্দু রাজবংশ গজপতি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যাধিপতি অনঙ্গ ভীমদেব কাঁসাইয়ের উত্তর প্রান্তের এলাকা থেকেও রাজস্ব আদায় করতেন।[২] উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের শাসনকালে ও মোগল আমলে মেদিনীপুর সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

এই অঞ্চলের আদিম জনজাতির সর্দার বা স্থানীয় শাসকরা স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়েই গণমিলিশিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিল। এঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং সুচারুভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল। এ বিষয়ে লক্ষণীয় এখানকার বিভিন্ন জনজাতির জাতিসত্তার পরিচয় এই অঞ্চলের নাম বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিদ্যমান। ভূম শব্দ যোগের মহলগুলিতে ভূমিজ, কুর্মি, মুণ্ডা ও অন্যান্য অধিবাসী সম্প্রদায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসবাস করতেন। যেমন— মল্লভূম, ভঞ্জভূম, শিখরভূম (পাঁচেদ ও পঞ্চকোট)।

এই অঞ্চলে অরণ্যবেষ্টিত রুক্ষ অনুর্বর ভূমিতে অনুৎপাদক কৃষি ও অনুন্নত উপকরণ নিয়ে যৌথ শ্রম ও যৌথ মালিকানা দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই আদিম গোষ্ঠীগত মানসিকতা লক্ষ করা যায়। গ্রামের ভূসম্পত্তি বা জোতজমিতে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সমষ্টি ও গোষ্ঠীগত মালিকানা, দলপতি ও গ্রামপ্রধানের দায়বদ্ধতা, গ্রামের বিচারব্যবস্থা, আইন ও সামাজিক আচার বিচারে দলনেতা বা দলপতির নির্দেশের মান্যতা, গ্রামপ্রধান বা দলনেতার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থেকেছে। এই সব দলনেতার আদিবাসী বৈশিষ্ট্য মণ্ডল বা মণ্ডলসর্দার, মুখিয়া, মুণ্ডা-মাঝি, প্রধান, দেশমণ্ডল, পরগনাইৎ, মানকি নামে পরিচিত। কুর্মি আধিক্য গ্রামগুলির দলপতি বা গ্রামপ্রধান মণ্ডল বা মাহাতো; ভূমিজ গ্রামগুলিতে নেতৃত্বে সর্দার; সাঁওতাল প্রধান গ্রামগুলির নেতা হলেন মাঝি; মুণ্ডা অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মুণ্ডা, আবার মিশ্র সম্প্রদায়ের গ্রামগুলিতে গ্রামপ্রধান হিসেবে পরিচিত। এরকম গ্রামগুলিতে কুর্মিদের সামাজিক সংগঠনের দলনেতা হলেন দেশমণ্ডল, মুণ্ডাদের মান্‌কি, সাঁওতালদের পরগনাইৎ।

জঙ্গলমহল অঞ্চলের প্রশাসনিক বিভাজন মোগল আমলের থেকে বাংলা সুবাকে নানাভাবে বিভাজিত হতে দেখা যায়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায়, সম্রাটের রাজস্বমন্ত্রী টোডলমল বাংলা সুবাকে চৌত্রিশটি সরকারে বিভাজিত করেন। এর প্রতিটি সরকার আবার মহাল বা পরগনায় বিভক্ত। মোগল আমলে উড়িষ্যা সুবাকে এরকম মহাল বা পরগনায় ভাগ করা হয়। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের মাদলাপঞ্জি থেকে জানা যায়, উড়িষ্যার

হিন্দুরাজাদের শাসনকালে এক একটি এলাকাকে ‘দণ্ডপাট’ বলা হত।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুজা উড়িষ্যার প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন করেন। ওই সময় উড়িষ্যা সুবার ১২টি সরকারের মধ্যে উত্তর প্রান্তের ছ'টি সরকার যেমন— বস্তা, জলেশ্বর, মালঝিটা, মালজিটি, গোয়ালপাড়া, মাজকুড়ি বাংলা সুবার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ওই সময় বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোনা, বগড়ী ও পঞ্চকোট জমিদারী এলাকা নিয়ে নতুন একটি সরকার গঠন করা হয়েছিল। পেশকোষ সরকারের অধীন এলাকাগুলি নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজের এলাকা পরিচালনা করতেন।

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে টোডলমল-এর ৩০টি সরকারকে পরিবর্তিত করে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান বাংলা সুবাকে ১৭টি বৃহত্তর প্রশাসনিক ইউনিট ‘চাকলা’-তে পুনর্গঠিত করেন। তবে মহাল বা পরগনাগুলি অপরিবর্তিত থাকে। উড়িষ্যা সুবার যে ছয়টি মহালকে ইতিপূর্বে বাংলা সুবায় সংযুক্ত করা হয়েছিল, সেই সরকারগুলিকে চাকলা হিজলি ও চাকলা জলেশ্বরে যুক্ত করা হয়।

এইসময় মারাঠারা বারবার বাংলা আক্রমণ করে আলিবর্দি খাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। বাধ্য হয়ে আলিবর্দি ১৭৫১-তে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করেন। সেই চুক্তির শর্তানুযায়ী জলেশ্বরের নিকটবর্তী সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার সীমানা হিসেবে স্বীকৃত হয়। সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত পরগনাগুলিতে মারাঠাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর নদীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পরগনাগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। এগুলি চাকলা হিজলি, চাকলা জলেশ্বর ও চাকলা মেদিনীপুর বিভাজিত হয়। নবাব আলিবর্দী খাঁর রেন্টরোলে মেদিনীপুর চাকলার প্রশাসনিক সীমানায় পূর্বতন গোয়ালপাড়া, মালঝিটা ও জলেশ্বর সরকারের অংশ বিশেষ যুক্ত করা হয়। গোয়ালপাড়া সরকারের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের বিশাল অরণ্যবেষ্টিত জঙ্গলমহল এলাকাগুলি ধলভূম, বরাভূম, মানভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুর বা তুঙ্গভূম, ভেলাইডিহি, সিমলাপাল, সামন্তভূম (ছাতনা) প্রভৃতি মহাল বা পরগনাগুলি মেদিনীপুর চাকলায় অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১৭৬০-এ নবাব মীরকাশিম চুক্তি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলার রাজস্ব আদায়ের জমিদারী অধিকার দেন। ১৭৬৫ সালে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও হস্তান্তরিত উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার রাজনৈতিক ফরমান বা সনদ প্রদান করেন। তখন কোম্পানি সরকার মেদিনীপুর সন্নিহিত বৃহত্তর জঙ্গলমহল এলাকায় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিপত্য বিস্তার করেন। এই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরে কোম্পানি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি (military contenment) স্থাপন করেন , যা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি এতকাল এই অঞ্চলের স্থানীয় ভূম্যাধিকারী দলপতি বা সামন্ত শাসকরা নবাবকে নামমাত্র খাজনা প্রদান করে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের এলাকা পরিচালনা করতেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও রেভিনিউ সার্ভের মাধ্যমে জঙ্গলমহলের মহাল বা পরগনাগুলির রাজস্ব নির্ধারণ, পাইকান ও ঘাটওয়ালিসহ নিষ্কর ভূমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে অনিবার্য সংঘর্ষ হয়। ১৭৬৭-তে মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট জন গ্রাহামের নির্দেশে ও লেফটেনেন্ট কর্নেল ফার্গুসনের নেতৃত্বে জঙ্গলমহলের রাজা মহারাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়। এই ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের সামন্ত শাসকেরই এবং তাঁদের অনুগত পাইক, সর্দার, ঘাটওয়ালি, মণ্ডল, মাঝি, প্রধান ও সাধারণ প্রজাবর্গ মিলিতভাবে সর্বাত্মক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাসে এই সংগ্রাম চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সর্দার, পাইকদের নেতৃত্বে যে ভয়াবহ চুয়াড় বিদ্রোহ হয়, তার কেন্দ্রস্থল ছিল কর্ণগড় ও তার নেতৃত্বে ছিলেন রানি শিরোমণি। তাঁর জমিদারীর প্রশাসনিক কার্যালয় ও আবাসস্থল এই কর্ণগড়। এই বিদ্রোহের ভয়াবহতায় কোম্পানি বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীতে তলব করে বিদ্রোহ দমনে সফল হন।

২. Ascoli F.D. Early Revenue History of Bengal, 1812
এ কে জেমসন, মেদিনীপুর জেলা সার্ভে এন্ড সেটেলম্যান্ট রিপোর্ট, ১৯১১-১৭

জঙ্গলমহল ও মানভূম জেলা

চুয়াড় বিদ্রোহের ভয়বহতা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে কোম্পানি সরকার চাইলেন মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের অরণ্যাঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা গঠন করার। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলিতে পুলিশ চৌকি বসালেন। আর একটা সমস্যা হচ্ছিল বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বনাঞ্চল ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্ধারণ নিয়ে। প্রশাসনিক কাজে জেলা কালেকটর ও অন্যান্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছায়। ১৭৯৯-তে বিদ্রোহের পর সেই সমস্যা চরমে পৌঁছায়। বাধ্য হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮০৫-এর রেগুলেশনের মাধ্যমে বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের অরণ্যাঞ্চল পরগনাগুলিকে ঐসব জেলা থেকে পৃথক করে 'জঙ্গলমহল জেলা' (Jungal Mahal District) গঠন করেন। নবগঠিত জেলা সদর হল বাঁকুড়া। আলেকজাণ্ডার বুয়েরার এবং পাকেনশান হলেন নতুন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেকটার। তেইশটি মহল বা পরগনা নবগঠিত জেলার প্রশাসনিক এলাকায় যুক্ত করা হল।

এই নতুন জঙ্গলমহল জেলার বাইরে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে আর্থসামাজিকভাবে সমভাবাপন্ন ও সামাজিক সমীকরণে অভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত যে পরগনা বা মহালগুলিকে রেখে দেওয়া হল সেগুলি হল : দিগপারুই, চিয়াড়া, নয়াবসান, বেলিয়াবেড়া, খেলাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণপুর, শিলদা বা ঝাটিবনি, জামবনি, রোহিনী, দীপকিয়ারচাঁদ, লালগড় বা সাংকাকুলিয়া ও রামগড়– এগুলি এখন মোটামুটি ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত। [Jamieson A.K. (1918) Final report on the survey and settlement operation in the district of Midnapore1911-1917] আবার ও ম্যালি [Bengal District Gazetteers Midnapore O'malley L.SS, 1911] উল্লেখ করেছেন। অরণ্যবেষ্টিত আদিম উপজাতি অধ্যুষিত ভঞ্জভূম, বাহাদুরপুর, ধারেন্দা পরগনাগুলি প্রথম থেকেই মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ছিল। বগড়ি পরগনা (গড়বেতা থানা) ১৮০১ সালে বর্ধমান জেলা থেকে মেদিনীপুর জেলায় হস্তান্তর করা হয়।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পরগনা বরাভূমসহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিজ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ফলে বিদ্রোহের অল্পদিন পরেই জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে ফেলে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশন জারি করে (Regulation XIII of 1833) জঙ্গলমহল জেলাকে বিলুপ্ত করা হল। এর ফলে একটি নতুন জেলা গঠিত হল মানভূম।

জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটিয়ে ঐ জেলার এলাকাগুলিকে বর্ধমান, নবগঠিত মানভূম জেলার মধ্যে ভাগ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হল। মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল যে ধলভূম পরগনা তাকে মানভূমে যুক্ত করা হয়েছিল, তা সিংভূম জেলায় যুক্ত করা হল। এই কাজ অনেকদিন ধরে চলছিল। ১৮৩৩-এর রেগুলেশন অনুসারে জঙ্গলমহল ভেঙে তার অংশগুলি সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর মহালগুলিকে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল। মানভূম জেলায় অবিভক্ত মানভূমের এলাকাগুলি ছাড়াও রাইপুর, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর ও ধলভূমকে যুক্ত করা হল। জেলার সদর কার্যালয় ছিল মানবাজার। পুরুলিয়া মানভূম জেলার সেন্ট্রাল হওয়ায় মানবাজার থেকে সদর কার্যালয় পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২০নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিকে ছোটনাগপুর বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এবং নন রেগুলেশন বিভাগ হিসেবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জেলা প্রশাসনের ভার থাকল ডেপুটি কমিশনারের ওপর। ছোটনাগপুর ডিভিসনের অন্তর্গত হল যে পাঁচটি জেলা, সেগুলি হল— হাজারিবাগ, রাঁচী (রামগড়), পালামৌ, মানভূম ও সিংভূম। এই ডিভিশনে কয়েকটি ছোটবড় সামন্তরাজ্য ছিল, এগুলি হল— ময়ূরভঞ্জ, সরাইকেলা, খোরাসান ইত্যাদি।

কাউপ্লান্ড তাঁর গেজেটিয়ারে লিখেছেন: The district of jungle mahal was broken up, The estates of Senpahari, Shergarh and Bishnupur were transferred to Burdwan and a new district called ManBhum with its headquarter at Manbazar constituated including the present area of the district and estate Super Raipur, Ambikanagar, Simlapal, Bhelaidihi, Phulkusma, Shamsundarpur

and Dhalbhum in 1838, the headquarter was removed to Purulia, discribed them as lying in centre of the jungle. Prior to mutiny (Sepoy Mutiny 1857) the only further change was the transfer of Dhalbhum to Singbhum and the change of the title of chief officer, the principal assistant at Purulia, as the Deputy Commissioner, and the Agent to the Governor General for the South-West Frontier, the Commissioner of Chotonagpur by Act XX of 1854 (Bengal District Gazetter, by H. Coupland 1911, Page-65)

এই নতুন জেলা বিভাগ বা প্রশাসনিক বিন্যাস করেও প্রশাসকরা ছোটনাগপুর ডিভিসনের জেলাগুলির বিশেষত জঙ্গলমহল শাসনের জন্য যে নীতি নিয়েছিল তাতে স্থানীয় সামন্ত শাসক বা জমিদারদের ওপরই নিজ নিজ এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং ছোটখাটো ফৌজদারি অপরাধের বিচারের দায়িত্বভার তাদের উপরেই অর্পিত হল। ব্রিটিশরা ভারত শাসনের যতগুলি আইন প্রণয়ন করেন, তার কোনোটাই জঙ্গলমহলের জেলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি। এই অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, সামাজিক প্রথা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ধর্মীয় লোকায়ত আচার-আচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের নিজস্বতা ছিল। কোম্পানির সরকারও আদিবাসী সমাজের প্রথাগুলিকে সামাজিক ও জমিসংক্রান্ত বিষয়ে আদিবাসী সমাজের প্রথাগুলিকে অনেকাংশে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করলেন, অন্যদিকে ফৌজদারি অপরাধের বিচারের দায়িত্বও স্থানীয় শাসনকর্তাদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলীর হাতেই তুলে দিলেন।

দুর্ধর্ষ ভূমিজ বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার পর ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত নড়ে গেল— যদিও শেষ পর্যন্ত সে বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভব হল। মানভূম জেলা সদর পুরুলিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। ডেপুটি কালেকটর ক্যাপটেন হোয়াস্ক পুরুলিয়া ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান। বাঁকুড়ার শেখাওয়াত রেজিম্যান্টের এক ব্যাটেলিয়ান সিপাহি অবস্থান করেছিলেন। যদিও অঘটন কিছু ঘটেনি। কিন্তু বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন (Government of India Act- 1858) পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির হাত থেকে ভারত শাসনের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হল। এই সময়ে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য মানভূম ও বর্ধমান জেলার সীমানা পুনর্বিন্যাস করে নতুন বাঁকুড়া জেলা গঠিত হল। ১৮৭১-এ মানভূম জেলা থেকে ছাতনা পুলিশ সার্কেল এলাকা (ছাতনা ও মাহিসারা পরগনা) বাঁকুড়া জেলায় যুক্ত করা হল। আবার ১৮৭৯- মানভূম জেলা থেকে খাতড়া ও রাইপুর থানা এবং সিমলাপাল পুলিশ ফাঁড়ির এলাকাগুলি যেমন— সুপুরি, অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি পরগনাগুলি বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল। অন্যদিকে বর্ধমান জেলা থেকে নিয়ে সোনামুখী, কোতুলপুর, ইন্দাস থানা এলাকাগুলি বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

ব্রিটিশ শাসনকালে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যে বিভাগগুলি ছিল, সেগুলি বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, নর্থ বিহার, সাউথ বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা। ১৯১২-র ২২ মার্চ বিহার ও উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করে বিহার-উড়িষ্যা নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। পাটনা হল সংযুক্ত বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী। ১৯৩৬-র ১ এপ্রিল আবার বিহার-উড়িষ্যা দুটি পৃথক প্রদেশ হল। কটক হল উড়িষ্যার রাজধানী। এভাবেই বৃহত্তর জঙ্গলমহলকে ভেঙে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ গড়ে সমগ্র আদিবাসী সমাজের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করা হয়। ২০০০ সালে আবার বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হল। এসবের দ্বারা জঙ্গলমহলের প্রকৃত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো হল।

একই ভাষাভাষী এলাকাগুলিকে নিয়ে রাজ্য গঠনের গণ আন্দোলনের ফলে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুধুমাত্র মানভূম জেলার এলাকাগুলি পুনর্বিন্যাস করে। অথচ মানভূম জেলা সম্পূর্ণভাবে বাংলা উপভাষার অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক কারণে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং শিল্পাঞ্চল ধানবাদ মহকুমার চন্দনকোয়াড়, কাতরাস, ইচ্ছাগড়, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ধানবাদ জেলা হিসেবে বিহার প্রদেশে যুক্ত করা হল। আর মানভূম জেলার দক্ষিণ-

পশ্চিমাংশে অবস্থিত কোডার, পাতকুম, চাণ্ডিল, পটনদা অঞ্চলগুলি সিংভূম জেলার সরাইকেলায় মহকুমায় যুক্ত করা হল। এর ফলে শিল্পাঞ্চল জামসেদপুরের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার জন্য । পুরুলিয়া মহকুমার অবশিষ্ট মানভূমের মধ্যবর্তী রুক্ষ অনুর্বর অঞ্চল যেমন— বরাভূম, পাঞ্চেত, ঝালদা, বাঘমুন্ডি, বাগনকোদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, কাশীপুর, মানভূম মহলগুলি পুরুলিয়া জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হল। ফলস্বরূপ ইতিহাসের পাতা থেকে মানভূম জেলা চিরকালের জন্য মুছে গেল এবং পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পুরুলিয়া নতুন জেলা হিসেবে যুক্ত হল।

কুড়মালি বা কুর্মি ভাষা

কুড়মি, কুড়মালি বা কুর্মি ভাষা ও সম্প্রদায়ের উৎস সন্ধানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসে, অরণ্য ও পর্বত বেষ্টিত, দুর্গম, অনুর্বর, রুক্ষভূমিতে বসবাসকারী যে আদিম ও আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথম বন কেটে বসত গেড়েছিলেন, পাহাড় কেটে সমভূমি গড়েছিলেন; তাদের আদি উৎসের পরিচয় আছে এই কুড়মি শব্দটির মধ্যে। তাড়া-কুড়া থেকে কুড়মি শব্দটির জন্ম। মাটি কেটে, মাটি তেড়ে, কুড়ে বসত ও সমভূমি যারা নির্মাণ করেছিল, বাসযোগ্য যারা ভূমি, আবাদযোগ্য জমি যারা গড়েছিল তাদেরই অন্যতম সম্প্রদায় কুড়মি বা কুর্মিরা। এদেশে প্রাচীন যে গোষ্ঠী পাহাড় অরণ্য সাফ করে বসতি নির্মাণ করেছিল, সেই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকরাই মূল আদিবাসী। অনেক পরে আর্যরা এদেশ আক্রমণ করে নিজেদের আধিপত্য ও সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে নিজেরাই দেবদেবী পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। আর ভারতবর্ষের মূল অধিবাসীরা আদিবাসী ও তপসিলী উপজাতি, অনুন্নত সম্প্রদায় পরিচয়ে ব্রাত্য ও অপাঙক্তেয় হয়ে রইল। অস্তিত্বের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ে রইল আজও।

অরণ্যাঞ্চলের বা পর্বত পাহাড় ঘেরা ভূমির যে জঙ্গলমহল, যা ছোটনাগপুরের মালভূমি নামে পরিচিত; আজ যা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি হল কুর্মিরা। কুর্মি বা কুড়মি মাহাতোদের ভাষাই কুর্মালি বা কুড়মালি ভাষা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি পূর্ণাঙ্গ ভাষা। এঁরা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে কুড়মালির স্বীকৃতি দাবি করেন। ছোটনাগপুরের নাগভাষা হিসেবে কুড়মালি স্বীকৃত। বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এটি আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে আদৃত। বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ ও আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্কৃতির লেখকগণ এই ভাষা ও ভাষাঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছেন। কুর্মি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তাঁর 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ছোটনাগপুর সন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহারের ধানবাদ জেলা,

সিংভূমের সিংভূম ও সরাইকেলা মহকুমা, রচিরবঞ্জু, সিল্লিতামাড়, সোনাহাতু আদি পাঁচ পরগনা, অন্যদিকে পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলা, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল। এই অঞ্চলের লোকেরা বাংলাভাষী। এখানকার আদিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলারই উপভাষা– কুড়মালি। ড. সুকুমার সেন এই ভাষাকে 'কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী' বলেছেন। (ড. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৯, (পৃ. ১৪৯) তিনি লিখেছেন, 'মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তের ধলভূমের এই মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী বলা যায়।' পৃ. ১৪৯ কুর্মি মাহাতো সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি। কুর্মিদের আদি বাসভূমি শিখরভূম। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মূল কুর্মালি ভাষা এখনো পাঁচ পরগনা ঝালদা আদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অন্য সব জায়গায় কুর্মি মাহাতোরা ঝাড়খণ্ড উপভাষায় কথা বলে। এই ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার বিবর্তন বিষয়ে ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো লিখেছেন, মগহী-নাগপুরিয়া-কুর্মালির পর ঝাড়খণ্ডী বাংলা। প্রাচীনকালে মগধে চেরপাদ শাসক উপজাতি বাস করত। তারাই পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডে এসে মুণ্ডা ও কুর্মি নামে দুইটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে থাকা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিভিন্ন হওয়ার কারণে এদের ভাষা ও সংস্কৃতি ও জীবনচর্যাতেও পার্থক্য ঘটতে থাকে কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মুণ্ডারা প্রধানত ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বাসভূমি স্থাপন করে। কুর্মিরা দামোদর, কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলিতে বাস করতে শুরু করে। একে কৃষিকার্যে সুদক্ষ, তার উপর উর্বর জমি তাদের অধিগত হওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মুণ্ডাদের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। স্বভাবতই কুর্মিরা মুণ্ডাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মুণ্ডাদের আর একটি শাখা কুর্মি অধ্যুষিত অঞ্চলে জমির মালিক হওয়ায় তারা ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কুর্মিদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আচার আচরণে ভাষা ও সংস্কৃতিতে তারা কুর্মিদের সাথে একাকার হয়ে পড়ে। পৃ. ২৪-২৫

কুর্মিদের ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতির আলোচনায় সমসাময়িক ব্রিটিশ

প্রশাসকদের বিবরণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। বাংলা তথা ছোটনাগপুর সন্নিহিত অঞ্চলের আদিম জনজাতিগুলির সমাজব্যবস্থা, জাতিসত্তা, আচারআচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি, মায় জীবনচর্যা অনুসন্ধানে ব্রিটিশ প্রশাসকদের তথ্যসমৃদ্ধ নথি, বিবরণী ও গ্রন্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এঁদের অনেকেই জাতিতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক। আদিবাসীদের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায় কুর্মিদের সম্পর্কে যাঁদের আলোচনায় পাওয়া যায়, তাঁর হলেন এডওয়ার্ড ডালটন, হারবার্ট রিজলে, জর্জ ক্যাম্পবেল, ফান্সিস বুকানন, এল এস এস ও'ম্যালি ও হারবার্ট কাউপ্লাণ্ড। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, সিভিল সার্ভিসে তাঁদের মেধা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আর প্রশাসক হিসেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের ওই কালজয়ী নথি রচনায় সহায়ক হয়েছে।

এঁদের মধ্যে Herbert Hope Risley (১৮৫১-১৯১১) একজন খ্যাতনামা ও দক্ষ প্রশাসক এবং জাতিতত্ত্ববিদ (Ethnographer) ভারতের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রাক অনুসন্ধান ও সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। তিনিও কর্নাল ডালটনের মতো ছোটনাগপুর ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত The Ethnographic Survey of India- ভারতীয় জাতিবর্গের বৈচিত্রের ইতিহাস। ১৮৯১ সালে লেখেন The Tribes and Castes of Bengal- চারখণ্ডে প্রকাশিত। ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মজীবনের সামগ্রিক স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে রিসলেকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। তাঁর পূর্বজ ডালটনের কুর্মালি জাতি সম্পর্কিত ভ্রান্তির নিরসন করতে পেরেছিলেন। কুর্মিদের জাতিতত্ত্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি, জীবনচর্যার মতো ভাষা সম্পর্কেও রিসলের মতও অনেক বেশি গ্রহণীয়। রিজলে বলেছেন সমসাময়িক কালের মধ্যে আদিম উপজাতি সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ভাষা ছেড়ে সেই অঞ্চলের প্রচলিত আধুনিক উপভাষাকে গ্রহণ করেছে। যেমন দ্রাবিড় গোষ্ঠীভূক্ত ভূমিজ, কুর্মি ও মাহালী সম্প্রদায়গুলি এখন বাংলা উপভাষায় কথা বলে।

রিজলের এই মতের সমর্থন মেলে আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের Linguistic Survey of India -1892 গ্রন্থের ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যায়ে। রিজলে লিখেছেন, 'A number of tribes within recent times adopted Aryan dialects and

abandined their original languages. Thus the Dravidian Bhumij, Kurmis and the Mahalis of western Bengal now speak in Bengali.' (Introductory Essay, The Tribes and castes of Bengal, Vol-I, H. H. Resley, P- x)

গ্রিয়ার্সন বলেছেন ছোটনাগপুরের কুর্মিরা (কুড়মিরা) অনেকেই কুর্মিদের নিজস্ব কুর্মালিতে কথা বলেন আর অনেকেই বাংলা উপভাষার কথা বলেন। আর মানভূম জেলা ও সন্নিহিত জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে শুধুমাত্র কুর্মি উপজাতির লোকেরাই নয়, অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই ভাষায় কথা বলেন। গ্রিয়ার্সন আরও বলেছেন, এই ভাষা হল মগ্হী (Magahi) ভাষার অপভ্রংশ।

'Magahi is not language of any locality. It is essentially a tribal language ... In Manbhum & Kharswan, the corrupt Magahi as Kurmali Thar. The ward `Thar' means literally fashion, and the name means the Aryan language as spoken in the Kurmali fashion. It is also known as `Kortha' or in the North-West of Manbhum as `Khatta' and in the Wesrt of the same district as `Khattahi'. It is spoken all over the district but most generally in the West and South West. It is in the Manbhum, written in the Bengali character, and this has led to its having been described by some as a dialect of that language.' (Linguistic Survey of India, Vol- V, 1903, p. 147)

স্থানীয় উচ্চারণে যা কুর্মালি 'থর' নামে পরিচিত খরসয়ানে তা মগহীর অপভ্রংশ। থর— অর্থে অবিকল আক্ষরিক পদ্ধতি।

গ্রিয়ার্সন আরও উল্লেখ করেছেন,

'There are however emigrants from the high-lands into the Bengali speaking areas. These have retained there own languages, though as could be expected, a small people living for generations in the contact with a great people, they have not resisted the

temption of borrowing word & grammatical forms from those amongst whom they live. The result is a kind of mixed dialect, essentially Bihari in nature, but with a curious Bengali colouring. (page- 15, Vol-V (Part- II, 1903)'

অতীতকালে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক উপজাতি সম্প্রদায়ের বাংলাভাষী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটে। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় বাংলাভাষী মানুষদের কাছাকাছি দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী ভাষা সংস্কার গড়ে তুলেছে। ফলে 'মিশ্র আঞ্চলিক ভাষার'সৃষ্টি হয়েছে। যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল— বাংলা প্রলেপযুক্ত বিহারী ভাষা।

গ্রিয়ার্সন আরও বলেছেন, ছোটনাগপুর ডিভিশনের কুর্মি সম্প্রদায়ের সবাই কুর্মালিতে কথা বলে না। অনেকে বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। শুধু কুর্মালি নয়, অন্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই ভাষা কথা বলে।

'As the Kurmis(4, 39, 814, living Manbhum, Hazaribagh, Ranchi, Palamu, Lohardaga, Orissa & Chotanagpur Tribhutiony states a per sensus report of 1901) do not speak corrupt Bihari many of them speak Bengali and Oriya, on the otherhand it is not confined to one caste, but also spoken by people of other tribes...The corrupt dialect was been returned under various names, but in everyone it is essentially the same form of speech.' (Vol-V, Part- II, Page- 146)

কুড়মিদের ব্যবহৃত ভাষা প্রসঙ্গে ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো বলেছেন, আদি অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর সম্প্রদায়গুলি এখনো তাদের নিজস্ব অস্ট্রিক ভাষাকে ত্যাগ করেনি। কিন্তু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজস্ব ভাষা বর্জন করে আর্যভাষার কোন না কোন উপভাষাকে গ্রহণ করেছে। প্রতিটি পৃথক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় উপযোগী এক একটি ভাষাসংস্কার গড়ে নিয়েছে। আলোচ্য অঞ্চলে

যেমন ভূমিজ, মুণ্ডা, কুর্মি, বাগাল, কামার, কুমোর, ভূঞ্যা আদি আর্যউপভাষাভাষীদের বসবাস আছে, তেমনই অস্ট্রিক ভাষী সাঁওতাল, কোল, হো, কোড়া আদিবাসীদের বাস আছে। কুড়মি-মাহাতো, ভূমিজ, খাড়িয়া, কামার, কুমোর, বাগাল আদি সম্প্রদায়গুলো ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষাভাষী। পৃ. ২১

ড. মাহাতো আরও লিখেছেন, কুর্মিদের নিজস্বভাষা 'কুর্মালি' মানভূম ও ধানবাদের সীমিত অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের অন্যত্র কুর্মি মাহাতোরা ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় কথা বলে। শুধুমাত্র কুর্মিরাই নয়, কুর্মি ছাড়া ভূমিজ, কামার, কুমোর, বাগাল, ভূঞ্যা, বাউরী ইত্যাদি জঙ্গলমহলের মূল আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো এই বাংলা উপভাষা বা ঝাড়খন্ডী বাংলায় কথা বলে। ড. সুকুমার সেনও একে 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা' উপভাষা বলেছেন। আলোচ্য অঞ্চলের বসবাসকারী কুর্মি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই এই ভাষায় কথা বলে— এই ভাষা প্রতিবেশীদের আখ্যায় 'কুড়মি ভাষা বা মাহাতো ভাষা'।

সামাজিক জীবনচর্যা

আদিম আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয়বাহী কুর্মিদের জীবনধারা, লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মভাবনা, বৃক্ষপূজা, পাহাড়পূজা, পশুপাখির পূজা প্রভৃতির আলোচনা করলে দেখা যায় ছোটনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুর্মিদের সাদৃশ্যই প্রমাণ করে এঁরা একই উপজাতির অন্তর্ভূক্ত। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ন্যূনতম পার্থক্য দেখা যায়। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তাঁর 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কুর্মিদের উৎসব পার্বণ, সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে লক্ষ করা যায়, এই অঞ্চলের আদিবাসীদের ধর্ম বলতে আদিমতম ধর্মকেই বোঝায়। পশুপাখি, গাছপালা, ধুলোবালি, নদীনালা, পাথর সব কিছুর মধ্যেই দেবতা রয়েছে। এ বিষয়ে কুর্মিরা অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই সর্বাস্তিবাদী। এখানকার কুর্মি, ভূমিজ, বাগাল, খাড়িয়া, মুণ্ডাসহ সমস্ত আদিবাসীরা আদিম মানুষের মতো এই সর্বপ্রাণ ধর্মে বিশ্বাস করে। হিন্দু সমাজের কোনো আর্যদেবতা নয়, বা মনুর বিধান নয়। ফলে আদিম মানববিশ্বাসে কুর্মিরাও সর্বাত্মক ভূত পূজায় বিশ্বাস করে। মাঠ, নদী-নালা, বনজঙ্গল, পাহাড়, অন্ধকার গৃহকোণ সর্বত্রই ভূতপূজা হয়। আর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী গরাম দেবতা সবার উপরে। এই গ্রামদেবতাদের বিভিন্ন রূপ হল— গরাম, ধরম, করম, বড়াম, ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা, বড়পাহাড় ইত্যাদি। আর ভূত হল কুদরা বাঘুৎ, দুয়ারসিনি, সাতবাহনি ইত্যাদি। এদের কেউ কেউ আবার দেবদেবী।

সব আদিবাসীরাই পেশায় অল্পবিস্তর পৃথক হলেও চাষাবাদ ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এদিক থেকে ভূমিজ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাড়িয়া, কামার, কুমোর, বাগাল, ভূঞ্যা প্রভৃতির সঙ্গে কুর্মিদের সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে। ফলে অন্যান্য সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো কুর্মিদেরও কৃষি ও ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবই প্রধান। যেমন— ভাদু, টুসু, বাঁধনা, করম, রোহিন, গমা, চিত, ভগ্‌তাপরব (চড়ক) ইত্যাদি। এই সব উৎসবকে কেন্দ্র করে দাড়শ্যালা বা পাঁতানাচ, জাওয়া নাচ, কাঠি নাচ, ছো-নাচ ইত্যাদি এদের মধ্যে পাঁতানাচম জাঁতাগান, আহীরাগান, টুসুগান, ছো নাচের গান, ঝুমুর, টুসু, উদায়া গান।

সারা পৃথিবীর আদিম মানব সমাজের মধ্যে নারী সমাজের কিছু উৎসবের মধ্যে উর্বরতার মিথ (Fartility Myth) সম্পর্কে James George Frazer তাঁর The Golden Bough- Volume- XII, 1906-1915 গ্রন্থে আলোচনা করেন। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে যে সব ঋতু উৎসবের আলোচনা করেছেন তার কয়েকটি কুমারী কন্যার উর্বরতাবাদের সঙ্গে জড়িত। কুমারী কন্যাদের উৎসব, নৃত্যগীত, পূজা-আচার; এইসব ঋতু উৎসব কৃষি উৎসবের উপকরণ। শস্য উৎপাদন, প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে উর্বরতার অনুষঙ্গ মিশে আছে। ফলে এই সব কৃষিউৎসবের সঙ্গে কুমারী কন্যাদের নিবিড় সম্পর্ক।

জঙ্গলমহলের কৃষিবর্ষের শুরু হয় পয়লা মাঘ। চৈত্র মাসে ভগতাপরব (চড়ক)। বৈশাখে লোকউৎসব রোহিন। রোহিনে উৎসব আছে, নৃত্যগীত নেই। আষাঢ় মাসের উৎসব অম্বুবাচী, গমা-রাখি পূর্ণিমা, চিত অমাবস্যা, মনসা পূজা- এই পূজায় সখীগান হয়। ভাদ্রমাসের একাদশীতে করমপরব, করমপূজায় করম নাচ-গান সারা অরণ্যানিকে মুখরিত করে। এই করম পরবের পরই কুমারী মেয়েদের জাওয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়। এতেই জাওয়া গান ও জাওয়া নাচ হয়। ভাদ্রমাসে আরও একাধিক উৎসব থাকে কুর্মি ও আদিবাসী জীবনে, ছাতাপরব, ইন্দ, জিতিয়া। ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদুপরব— কুমারী কন্যাদের প্রধানতম উৎসব। কুর্মিদের প্রধান উৎসব বাঁধনা পরব— কার্তিক অমাবস্যায়। এর সঙ্গেই সম্পর্কিত আহীরা গান। পৌষে টুসু পরব কুমারী মেয়েদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্বরতার উৎসব। এই উৎসবও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। টুসু গান লোকসংস্কৃতির এক অনবদ্য সম্পদ। আর সবশেষ পরব হল ভগ্‌দা পরব। ছো নাচ ও গান। এই নাচ-গান যদিও আচরণমূলক। কয়েকজন নৃত্যশিল্পীই এর ধারকবাহক। কুর্মিদের উৎসব অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীগত উপস্থিতি অন্যতম প্রধান উপজাতিগত বৈশিষ্ট্য। এদের পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করলে সদ্যজাতের শুভাশুভের জন্য কুর্মিরা ধরমপূজা করে। সন্তান কামনায় ধরমের মানত করা হয়। মানতের ফলে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে ধরমপূজা করতে হয়। এই পূজায় কোনো পুরোহিত লাগে না, কোনো মন্ত্রোচ্চারিত হয় না, গৃহস্বামীই পূজা করেন। তুলসীতলায় আতপচাল, মিষ্টি, দুধ, ফল ইত্যাদি সহযোগে পূজা দেওয় হয়। মানত করে পাঁঠাবলিও দেওয় হয়।

আবার পরিবারের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মকে উপলক্ষ্য করেও ধর্মের মানত করা হয়। জন্মকাল থেকে শিশুর মাথায় চুল রেখে দেওয় হয়। ধরমপূজার আগে তার মস্তক মুণ্ডিত করে ফেলতে হয়। কুর্মিরা ধরমপূজায় গোষ্ঠীভোজ দেয়। গ্রামের একই গোত্রের সমস্ত মানুষকে গোষ্ঠীভোজে আমন্ত্রণ করতে হয়। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ভোজ শুরুর আগে গ্রামের পথে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, ভোজ শুরু হবে, গোষ্ঠীর গোত্রের যে যেখানে আছ, সবাই চলে এসো। যে না আসবে তাকে গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ডাককেই বলে 'ধরম ডাক'। ধরম কুর্মিদের সম্প্রদায়গত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ধরম কুর্মিদের কুলদেবতা— গোত্র। কুর্মিদের মোট ৮১টি গোত্র আছে। কুর্মিদের প্রধান টোটেম হল কুর্ম। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী সম্প্রদায়ের টোটেমও কুর্ম। দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় আর এক ধরম বা ধর্ম পূজা লক্ষ করা যায়, যার ধর্ম ঠাকুর অবিকল কুর্মের মতো দেখতে। পণ্ডিত ও ডোম সমাজ এর পুরোহিত হয়। বৌদ্ধধর্মের উত্তরকালে রূপান্তরিত ধর্মপূজায় আবার ধর্মের মেলা ও গাজন হয়। শিবের গাজন সমস্ত বঙ্গের অন্যতম বড়ো লোকউৎসব।

যৌথ মালিকানা প্রথা কুর্মি ও আদিবাসী সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য। উত্তরকালে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। আজকাল বিয়ের পরই পরিবারের সন্তান পৃথক হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলমহলের রীতি হল পুত্র পিতার সংসার থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইলে সমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করে ভূমি ভাগাভাগি করে দেয়। অনেক সময় বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য কিছু জমি দেওয় হয়। অনেক সময় বৃদ্ধ পিতামাতা কোনো পুত্রের সংসারে আশ্রয় নেয়।

কুর্মি সমাজের কৌম যৌথ সামাজিক অবস্থান একটি বড় বিষয়। একই গোত্রের লোকজনের সামাজিক প্রাধান্য লক্ষণীয়। জঙ্গলমহলে দলনেতা বা গোষ্ঠীনেতার মাধ্যমেই এক একটি এলাকার বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। মণ্ডল বা নিজ পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন ও আশ্রিতদের মিলিত কায়িক শ্রমের দ্বারা একটি অংশ ভূমি বা জমিকে চাষযোগ্য করে তুলত। আর অবশিষ্ট এলাকা ইচ্ছুক

রায়তদের বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে মণ্ডলরাই বন্দোবস্ত করে দিতেন। একে মণ্ডল বা মণ্ডলীতত্ত্ব আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবেই জঙ্গলমহলের এলাকায় জনবসতি বা গ্রাম গড়ে উঠেছে। আমি আগেই শুরুতে লিখেছি, তাড়া, কুড়া অর্থে কুড়মি বা কুর্মি শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। গ্রামের সমাজব্যবস্থা, বিচার-আচার, আইন-শৃঙ্খলা যাবতীয় বিষয়ে মণ্ডলরাই কর্তৃত্বের অধিকারী। মণ্ডল পরিবারটিই মাহাতো বা মাহাতো ঘর নামে পরিচিত। এখনো এই গ্রামপ্রধান বা মাহাতোর আদেশ সবাইকে মেনে চলতে হয়। এই মাহাতোর ওপরই গ্রামের শুভাশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল, শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করত। এখন রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ, শিক্ষার প্রসার, জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্য নানা কারণে এই সব আদিবাসী সুলভ কৌম রীতি পরিবর্তিত হয়েছে।

কুর্মি সমাজের সামাজিক সংকার ক্রিয়া, বিবাহ ও জন্মসংস্কারের ক্ষেত্রেও সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন জন্মসংস্কারে সন্তানের জনমের পর সাতদিন বা নয়দিন পরে গ্রামে একই গোত্রভূক্ত পরিবারগুলির মধ্যে যে অনুষ্ঠান হয় তাকে কুর্মি সমাজ নত্তা , নর্তা (বা নবরাত্রি) বলে। পরিবারে কর্তাব্যক্তি গ্রামের একই গোত্রের সমস্ত পরিবারের সদস্যদের হলুদ তেল বিতরণ করে। নত্তা বা নবরাত্রির অনুষ্ঠানের পর শিশু পরিবার সমাজের গোত্রভূক্ত বলে ঘোষিত হয়।

কুর্মি সমাজে পরিবারের পরবর্তী বংশাধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিবাহ একটি সামাজিক স্বীকৃত প্রথা। কুর্মি সমাজের মেয়েদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিন্তু আলাদা গোত্রে বিবাহ দেওয়া হয়। কুর্মিরাও বিশ্বাস করে বিবাহ একটি পুরুষ ও একটি নারীর আত্মিক বা শারীরিক মিলন নয়। বিয়ে হল দুটি পরিবারের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক মিলন। ব্রিটিশ শাসক ডালটন ও রিসলের রিপোর্টে বিস্তৃত আকারে এই বিয়ের অনুষ্ঠান লেখা হয়েছে। বর ও কনের আনুষ্ঠানিক বিয়ের আগেই আম গাছের সঙ্গে বরের ও মহুয়া গাছের সঙ্গে কনের বিয়ে সম্পন্ন হয়। কুর্মিদের বিশ্বাস এর ফলে ভাবী দম্পতির বিবাহোত্তর জীবনের সবরকম বিঘ্ন আর দায় বহন করবে এই বৃক্ষদেবতা। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সম্পর্কের বিশ্বাস ও প্রকৃতির হাতে নিজেদের সমর্পন করা। এর

মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাস লালিত হয় প্রকৃতি সুরক্ষিত থাকলে নিজেরাও সুরক্ষিত থাকবে। সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল।

সামাজিকভাবে সমানাধিকার কুর্মালি সমাজের মেয়েদের না থাকলেও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নে নারী-পুরুষের অধিকার স্বীকৃত। পারিবারিক অসঙ্গতি বা অশান্তি ও অন্য কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের প্রয়োজন দেখা দিলে গ্রামপ্রধান বা মাহাতোর অনুমতিক্রমে বিচ্ছেদ হতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। আর এই বিচ্ছেদ প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর ওপর জলের ছিটা দেয় এবং আমগাছের একটি পাতাকে গ্রামপ্রধান ও সমাজের লোকজনের সামনে দু-টুকরো করে দেয়। আর স্ত্রীর হাতের নোয়ে (খাড়ু) খুলে দেয়। বিবাহ সংযোগ যে বৃক্ষদেবতাকে সাক্ষী রেখেই নারী-পুরুষের আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল—এখন সম্পর্ক বিনষ্টির নিদারুণ ক্ষেত্রে শুভাশুভের দায়ভাগ যেন সেই বৃক্ষদেবতাই বহন করে— এই কামনায় এরকম আচার সম্পন্ন করা হয়। সমাজগতভাবে এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে তারপর বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী অন্য যে কোনো জায়গায় বিয়ে করতে পারে।

মৃত্যুর পর মানুষের সৎকার বিষয়ে কুর্মিসমাজে মৃতদেহ দাহ বা কবর দেওয়ার প্রথা রয়েছে। যদি বাবা-মায়ের জীবিতাবস্থায় নাবালক সন্তানের মৃত্যু হয় তাহলে মৃতদেহের কবর দেওয় হয়। আর যদি বিবাহিতর মৃত্যু হয় তাহলে তাদের দেহ আগুনে সৎকার করা হয়। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর হাত থেকে নোয়া (খাড়ু) খুলে ভেঙে দেওয়া হয়। মাথার সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। মৃতের অশৌচে শ্রাদ্ধশান্তির কাজ দশ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণরাই এখন এই কাজে সাহায্য করে। রিজলে লিখেছেন, মানভূমের লোহারডাগা, ময়ূরভঞ্জ-এ কুর্মিদের শ্রাদ্ধশান্তিতে ব্রাহ্মণরা সহায়তা করে, তবে এই ব্রাহ্মণরা কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, এরা পতিত ব্রাহ্মণ। রিজলে আরও লিখেছেন কুর্মিদের সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচারণে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির সূক্ষ্ম প্রলেপ রয়েছে, কুর্মিদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানই তার প্রমাণ। (H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, 1892, page-524, Gayn Publishing House, Edition-2021)

কুর্মিরা যে সমাজে অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে সম্পন্ন, প্রতিষ্ঠিত ও

কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল, তা বিভিন্ন দক্ষ প্রশাসকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। এইচ এইচ রিজলে বলেছেন, কুর্মিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রজাস্বত্বের বিবিধ মালিকানায় কৃষক হিসেবে স্বীকৃত। এদের অনেকেই বড় জোতদার, অনেকে বিস্তৃত জঙ্গলমহল এলাকায় কোন না কোনো রাজা বা জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে তা নিজেদেরকে আর কুর্মি নয়, ক্ষত্রিয় তা রাজপুত হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। মেদিনীপুরের নয়াবসান পরগনার খেলাড়ের কুর্মি জমিদার স্বজাতি কুর্মিদের বিধবাবিবাহের প্রথা রদ করা ও চাষ-আবাদের সময় লাঙলে গাভীকে যাতে জোত না করা হয়, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি কুর্মি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন।

আর একটি ঘটনা হল পূর্ব মানভূমের পাঁচেদ রাজবংশের ঘটনা। পাঁচেদ রাজা নিজেকে গো-বংশী রাজপুতদের উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করেন। বাহান্ন পুরুষ আগে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কাহিনি অনুসারে কুর্মিরা বনের মধ্যে একটি সদ্যজাত শিশুকে গাভীর দুগ্ধপান রত অবস্থায় পায়, উদ্ধার করে এবং বড় হয়ে ঐ অঞ্চলে তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

আবার W. W. Hunter তাঁর Bengal Statistical Account, Manbhum- Page- 305-এ লিখেছেন:

মানভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ভূমিজ অধ্যুষিত গ্রামগুলির প্রধান সর্দার নামে পরিচিত। লোহারডাগা জেলার সীমান্তবর্তী এই জেলার পাতকুম ও বাগমুণ্ডি রাজস্ব বিভাগের গ্রামপ্রধানের নাম মুণ্ডা বা মুড়া। সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামপ্রধানের নাম সর্দার। ছোটখাটো বিষয়ের কর্তৃত্বের অধিকারীর নাম মাঝি। মাঝি ছাড়া সাঁওতাল সমাজে মাঝির উপরের পদ দশ-বারোটি সাঁওতাল প্রধান গ্রামের কর্মকর্তা হলেন পরগনাইত। মানভূমের কোল প্রধান গ্রামের প্রধান হলেন মানকি। আর কুর্মি অধ্যুষিত গ্রামের প্রধান হলেন মাহাতো। দশ-বারোটি গ্রামের কুর্মিদের প্রধানের নাম দেশমণ্ডল। সম্ভ্রান্ত কুর্মি পরিবারগুলি নিজেদেরকে মাহাতো বা কুর্মি মাহাতো বলে পরিচয় দেয়। মানভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাইপুর রাজস্ব বিভাগের

গ্রামপ্রধানের নাম মণ্ডল। সিংভূম জেলার গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি উল্লেখ করেছেন, সিংভূমের কোল অধ্যুষিত এলাকাগুলির অনেক গ্রামেরই গ্রামপ্রধান ছিলেন কুর্মিরাই— যারা মাহাতো নামে পরিচিত।

কুর্মিদের সমাজসংস্কৃতি বিষয়ে রিজলের বর্ণনা অনেক বেশি:

'In Chotanagpur and Orissa the Kurmis are still in a earlier stage of religious development. The animistic beliefs and characteristics of the Dravidian races are overlaid by the thinnest veener of the conventional Hinduism and vague shapes of ghosts or demons who haunt the jungles and rocks are real powers to whom average Kurmi look for the ordering of his moral and physical welfare.' Page- 534

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী কুর্মিরা এখনো উন্নতধর্মীয় ধ্যানধারণার প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। প্রকৃতির সর্বপ্রাণতাবাদে বিশ্বাসী দ্রাবিড় গোষ্ঠীভূক্ত এই উপজাতির জীবনচর্যা হিন্দুত্বের বাহ্যিক প্রথাগত প্রলেপ দ্বারা আবৃত। কিন্তু অসংখ্য সাধারণ কুর্মিরা আজও বিশ্বাস করে বনজঙ্গল, পাহাড় ও অন্ধকারে বিচরণকারী ভূত-প্রেত। জঙ্গল ও পাহাড়ের দেবতারাই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী আর তারাই শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভের জন্য কল্যাণকর। আজকাল শ্রাদ্ধ-বিবাহ ও কিছু কিছু পূজাপার্বণে কোথাও কোথাও পুরোহিত নিয়োগ হচ্ছে। যদিও কুর্মিদের সামগ্রিক জীবনে এখনো আদিম উপজাতি সুলভ আচার-আচরণ ও বিশ্বাস লক্ষ করা যায়।

টোটেম বা গোত্র

টোটেম হল কুলচিহ্ন। নৃতাত্ত্বিকরা মনে করছেন বিশ্বের নরগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশের স্তর পরম্পরায় টোটেম হল প্রাথমিক পর্যায়। প্রতিটি মানবগোষ্ঠী তাদের প্রাথমিক স্তরে কোনো না কোনো গোত্র বা কুলচিহ্ন তাদের বংশধারা হিসেবে মেনে এসেছে। উত্তরকালে শিক্ষাসংস্কৃতিতে অগ্রসর মানুষ আজও তাদের সামাজিক আচার আচরণে এইসব টোটেমকে পূজা করে বা আবাহন করে, বা সেই চিহ্নকে স্মরণ করে। উনিশ শতকে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই গোত্র হিসেবে টোটেমের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার ওজিবওয়া ও অ্যালগোস্কিয়ানদের ভাষায় একে বলা হয়— ওটোটেমান। এর অর্থ হল ভাই-বোনের সম্পর্ক। টোটেম (Totem) শব্দটি এখান থেকেই এসেছে। এই সমাজে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বা যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ।

হিন্দুদের দেবতাদের উৎসস্থলে যে দশাবতার স্তোত্র রয়েছে তা আমাদের টোটেম। উইলিয়াম ক্রুক মনে করেন, বরাহ, কুর্ম, মৎস্য, নৃসিংহ, কল্কি এসবই হল টোটেম। এমনকি হিন্দুদের দেবতার যে এক একটি পশু-পাখি বাহন হিসেবে সঙ্গী তারাও এক একটি টোটেম, যেমন— ব্রহ্মার বাহন হংস, শিবের বাহন বৃষ, কুমার কার্তিকেয়র ময়ূর, অগ্নির মেষ, বরুণের মীন— এ সবই টোটেম।

এমনকি বৈদিক ঋষিদের অনেকের নামের মধ্যে অমানব প্রাণীর নাম লক্ষ করা যায় এগুলিও টোটেম কেন্দ্রিক। এখন বিভিন্ন বংশ পরিচয় এই সব ঋষিদের নামেই পরিচিত হয়। এরকম ভরদ্বাজ হল ভরতপাখি থেকে নামকরণ, গরু থেকে গৌতম, কচ্ছপ নামাঙ্কিত কাশ্যপ, শুনক হল কুকুর থেকে, মৌদগল্য মাগুর মাছ থেকে, পেঁচা থেকে কৌশিক ইত্যাদি।

ছোটনাগপুরের অরণ্যঅঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে এই টোটেম বা গোত্র বিভাজন আজও স্বচ্ছন্দে লক্ষ করা যায়। স্যার হারবার্ট হোপ রিজলে বাংলার জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমীক্ষার কালে লক্ষ করেন কুর্মিরাও আদিবাসীদের মতো গোত্র বিভাজন পদ্ধতি মেনে চলে। এই আদিম আদিবাসী দের মতো গোত্রবিভাজনের মধ্যে দিয়েই তাঁদের ভারতের আদি দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে

সম্পর্কটি চিনে নেওয়া যায়। এবং এখানেই তাঁরা বিহার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী কুর্মিরা স্পষ্ট টোটেমবাদী এবং তাঁরা আদিম উপজাতি সুলভ গোত্র বিভাজনে বিশ্বাস রেখে মনে করে, মনুষ্যেতর জীবজন্তু, গাছ, মাছ, প্রকৃতির নানাবস্তুর সঙ্গে তাঁদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক আছে। ছোটনাগপুরের ভূমিজ, সাঁওতাল, কোড়া, মাহালী ইত্যাদি টোটেমের আভিধানিক সংজ্ঞা হল: a natural object or animal believed by a particular society to have spiritual significance and adopted by it as a emblem. (Oxford English Dictionary, 2007, p- 1523) উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা বিশ্বাস করেন প্রাকৃতিক কোনো বস্তু বা প্রাণি বা গাছের সঙ্গে তাদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। সমগ্র ভারতের সমাজ জীবনের একেবারে আদিস্তরে অসংখ্য অনার্য জাতি ও উপজাতিগুলির অবস্থান। এই সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠী বিভিন্ন শাখায় বিভাজিত, যেখানে ভিন্ন গোত্রে বিবাহই একমাত্র রীতি, সমগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রতিটি উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি কোনো না কোনো প্রাণী, গাছ, প্রাকৃতিক বস্তু-পাহাড়-পর্বত সব কিছুতেই তাদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক বিশ্বাস করেন। একই টোটেম পরিবারের লোকেরা সেই প্রতীকের পশু, পাখি, পতঙ্গ, প্রাণী, বৃক্ষ বা প্রকৃতির কোনো সম্পদ ইত্যাদিকে হত্যা বা নিধন, নষ্ট করবে না। পরিবর্তে সেগুলিকে যথোচিত মর্যাদায় রক্ষা করা, পূজা করা এ সবকেই সম্মান করাই এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ঐতিহ্যবাহী প্রথা। কুর্মি সম্প্রদায়ের কুরুম টোটেম ভূক্ত পরিবারগুলির সদস্যরা কচ্ছপকে কোনোভাবে হত্যা করে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে। কচ্ছপকে সিঁদুর পরিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শাঁখোয়ার গোত্রের সদস্যরা শাঁখ এবং শঙ্খজাতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করে না। এমনকি পরিবারের মহিলা সদস্যরাও শাঁখের তৈরি কোনো অলঙ্কার ব্যবহার করে না। টোটেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি হল, তারা কোনো না কোনো গোষ্ঠী, উপজাতি, বংশ বা পরিবারের সঙ্গে কোনো উদ্ভিদ বংশের সঙ্গে বা কোনো পাহাড়-পর্বত, প্রস্তরখণ্ড ও জড়জগতের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত। টোটেম হল একটা জীব, জন্তু বা উদ্ভিদ যাকে প্রকৃত পূর্বপুরুষ বা আদিপুরুষ হিসেবে ধরা হয়। আদিম জনজাতিগুলির বিশ্বাস যে সমষ্টিগতভাবে কোনো বংশ,

পরিবার বা পরিবারের সদস্যদের জীবন, ভালোমন্দ সবকিছুতেই রহস্যময়ভাবে ঐ উদ্ভিদ, জীব বা জড়বস্তুর সঙ্গে পুর্বপুরুষ সম্পর্কে জড়িত, ঐসব অতিপ্রাকৃত বস্তু থেকেই তাদের সৃষ্টি এবং তারা ওদের উপরই নির্ভরশীল। একই গোত্রভূক্ত মানুষরা মনে করে যে তাদের বংশে কোনো সন্তান জন্মালে সেই নবজাতকের মধ্যে দিয়ে ঐ টোটেম জীব বা উদ্ভিদ বা জড় প্রকৃতিরূপী ঐ টোটেমেরই তাদের বংশে আবির্ভাব ঘটেছে।

ছোটনাগপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের কুর্মিরা তাই বিশ্বাস করে অন্যান্য আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের মতোই বিভিন্ন টোটেম বা গোত্রভূক্ত পরিবার বা বংশের টোটেম প্রতীক কোনো প্রাণী বা বৃক্ষ বা জড় বস্তু ইত্যাদির মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে। তাই সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের সন্তুষ্ট করে রাখা এবং তাদের সম্মান জানানো তাদের বংশগত প্রথা। এবং এটা তারা আজও করে চলেছে। কুর্মিরা সামগ্রিকভাবে মনে করে যে কুর্ম বা কচ্ছপই এই বংশের আদিপুরুষ বা মূল টোটেম। তাই তারা কচ্ছপের কোনো ক্ষতি করে না। এবং কচ্ছপ পেলে তার কপালে সিঁদুর পরিয়ে তাকে আবার ছেড়ে দেয়।

টোটেম অনুযায়ী একই টোটেম পরিবার ভূক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই গোত্রভূক্ত পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাইবোন হিসেবে পরিচিত হয়, সেজন্যই সেই টোটেমভূক্ত পরিবারের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ— আদিম উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই প্রথা আজও সার্বিকভাবে পালন করা হয়।

কুর্মিদের টোটেমগুলির বিষয়ে হারবার্ট রিজলে যে তালিকা দিয়েছেন তা এরকম:

KURMI

Name of the Section	**Totem**
Kesarin	*Kesargrass*
Karar	*Buffalo*
Dumuria	*Dumurfig*

Chonchmutrarar *Spider*
Hanstowar *Tortoise*
Jalbannar *Net*
Sankhowar *Shell Ornament*
Bagbanuar *Tiger*
Katiar *Slik Cloth*
[H. H. Risley, The Tribes & Castes of Bengal, 1892, Page XIV Preface Introductory Essay]

রিজলে কুর্মিদের ন'টি টোটেমের পরিচয় দিয়েছেন, গোষ্ঠীর গোত্র ও তার টোটেম হল:

১।কেশরিয়া— কেসর ঘাস ৫।হাসতোয়ার— রাজহাঁস
২।কাড়ওয়ার— মহিষ ৬।জলবান্নার— জাল
৩।ডুমুরিয়া— ডুমুর গাছ ৭।শাঁখোয়ার— শঙ্খ, শাঁখা
৪।ছুঁচমুতরা— মাকড়সা ৮।বাঘবানুয়ার— বাঘ
৯।কাটিয়ার— রেশমী কাপড়

ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তাঁর 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, প্রচলিত লোককথা অনুসারে কুর্মিদের ৮১টি গোত্র বিদ্যমান। তিনি বলেছেন, গোত্র নামগুলি কখনো পেশাগত আবার কখনো টোটেম বা কুলতিলকগত হয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন এদের বারোটি গোত্র। সাধারণ পরিচিত গোত্রগুলো:

কাড়ওয়ার— মহিষকেশরিয়ার— কেশরঘাস
কুরুম— কচ্ছপবাঘবানয়ার— বাঘ
ছুঁচসুতরা— মাকড়সাডুমুরিয়ার— ডুমুর গাছ
হাঁসতোয়ার— হাঁস

টুডু, হিন্দোয়ার আদি টোটেমজাত গোত্র। আর পেশাগত গোত্র হল ডোমিয়ার, কাটিয়ার, তিরুয়ার, জালবুনার, বাঁশিয়ার, শাঁখোয়ার প্রভৃতি। কুর্মিদের এই গোত্র বিভাজন সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের সঙ্গে একই রকম। আবার বিষ্ণুচরণ মাহাতো তাঁর 'The History of Tribal Kurmis of Chotonagpur' বইতে লিখেছেন কুর্মি সম্প্রদায়ের মোট ১০১টি গোত্র বা

টোটেম রয়েছে। আসলে মূল আদি গোত্র থেকে অনেকগুলি শাখা গোত্র বেরিয়েছে।

কুর্মিদের ক্ষেত্রে তাদের টোটেম দেখা গেছে অভূতপূর্বভাবে তাদের স্বাভাবিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা মেনে নিতেই হবে। একটি বিষয় লক্ষণীয় কুর্মিসমাজে যে সমস্ত ব্রত উদযাপিত হয় 'ধরম পূজা' তার অন্যতম। সামাজিক বিধান অনুযায়ী সন্তান কামনায় ধর্ম ঠাকুরের মানত করে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে ধরম পূজা করতে হয়। অনেক সময় কুর্মি পরিবারে প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ার পর ধরম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবার এই ধরম পূজা হল গোষ্ঠীগত। তাই পূজার আগে এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য এবং এই গোত্রের সব সদস্যকে উপবাস করতে হয়। এর নিয়ম হল সূর্যোদয়ের আগে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে স্নান করতে হবে। ধরম পূজার ভোজ হল গোষ্ঠীভোজ। গ্রামস্থ গোত্রের প্রত্যেক সদস্যকে এই পংক্তি ভোজনে আহ্বান করা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, ভোজ শুরু হওয়ার আগে ঐ গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁয়ের পথে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, ভোজ শুরু হল, গোষ্ঠীর বা গোত্রের সমস্ত সদস্য যে যেখানে আছ, চলে এসো। যে আসবে না তাকে এই গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ডাককেই ধরম ডাক বলে। 'ধরম কুর্মিদের কুলদেবতা, গোত্র দেবতা, কুর্মবাচক ধরম তাই কুর্মিদের টোটেম বা কুলতিলক— কুর্মি সমাজজীবনে সেই ট্রেডিসন সমানে চলছে।'

ভাষা

ছোটনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে কুড়মালি ভাষা বলে। আগেই উল্লেখ করেছি, কুর্মি বা কুড়ি সম্প্রদায়ের জনগণ ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। আর এই সম্প্রদায়ের লোকের ভাষাকে মান্য ভষাতত্ত্ববিদেরা ঝাড়খণ্ডী ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। আবার বাংলাভাষায় প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঝাড়খণ্ডীকে বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। কুর্মি বা কুড়মালি ভাষায় বাংলার ঐ অঞ্চলের ভাষাভাষীদের যোগ লক্ষ করা যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাংলার ও কুড়মালি শব্দভাণ্ডার ও উচ্চারণরীতির সঙ্গে ঝাড়খণ্ডী উচ্চারণ রীতির যোগ সহজেই লক্ষ করা যায়। আবার এই কুড়মি ভাষায় কেবল কুর্মিরাই নয়, এই অঞ্চলের বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ও বলে থাকে। ফলে সাঁওতালি বা কুড়ুখ বা মৈথিলী ভাষার ও বাংলার এই অঞ্চলের বাংলা ভাষার সঙ্গে এর অনেক মিল রয়েছে। গ্রিয়ার্সন একে মগহীর অপভ্রংশ ভাষা বলেছেন। ছোটনাগপুরের বা মানভূমের খরসয়ানের এই ভাষায় কথা বলে। একে স্থানীয় ভাবে কুর্মালি 'থর' বলে। যদিও কুড়মালি ও ঝাড়খণ্ডী বাংলার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। আসলে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিহার সংলগ্ন অঞ্চলে যেমন বাংলার সঙ্গে বিহারীর সংযোগ ঘটেছে, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বাংলার সঙ্গে যেমন ভাষা সংযোগ ঘটেছে। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বর্ডার অঞ্চলে যেমন বাংলার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সংযোগ ঘটেছে। তেমি সুদূর অতীতে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের অনেকেই নিজস্ব ভাষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেননি। অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছাকাছি দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দাবলী গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উপযোগী মিশ্র ভাষা গড়ে নিয়েছে। ফলে মিশ্র আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। আসলে একটু লক্ষ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে এই অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কুড়মালি ভাষায় কথা বলে। আবার এই অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের বাইরের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরা ঝাড়খণ্ডী বাংলায় ভাব বিনিময় করে।

সাধারণভাবে মানভূমের লোকেরা বলে মানভূমের ভাষা কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি বাংলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা। এর নিজস্ব শব্দভাণ্ডার আছে। এর ব্যাকরণ ও শব্দগঠন পদ্ধতি আছে। এ হল ঠার ভাষা বা ঠাট্ ভাষা।

কুড়মালিতে ভাষাকে 'ভাখি' বলে। কুর্মিরা অন্য অনেক আদিবাসীদের মতো সূর্য উপাসক। 'হর' মানে বুড়াবাবা। এরা সারি বা সারণা ধর্ম মেনে চলে। এঁদের বংশ পরিচয় টোটেমিক। এদের ঠাকুর পূজার ইস্তুতি বা পদ্ধতি হল জহাইর—ঢলবুরু ঠাকুর, মহামাঁই। এদের মন্ত্রভাষা হল, জাহিরমাঁই জাহিরা বুড়ি, বুঢ়াবাবা, মহামাঁই, বনদেবী, কুদবাসিনী, বাঘুত প্রভৃতি বলে নিবেদন করে বলে— হে আদিদেব মহাদেব হর, বুঢ়াবাবা, বুঢ়িমাঁই, মাঁই বসমাতা আঁবা/ধরণী, এবং বিধাতা সুরুজ ঠাকুর জহাইর; বলে প্রণাম করে। কুড়মালি ভাষায় মাটি মানুষ-প্রকৃতি থেকে উঠে আসে শব্দচয়ন।তাই একে এঁরা বলেন প্রকৃতিজাত ভাষা। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বর্ণিত ভাষাতের মাতৃভাষায় কুড়মালি জাত ৭টি উপভাষা হল : ছত্রিশগড়ী, খোট্টা, কুড়মালি, নাগপুরিয়া, পাঁচপরগনিয়া, সদরি এবং সুরগুজিয়া। এঁরা এগুলিকে নাগভাষা বলেন। কুড়মালি ভাষা ক্রিয়া সমন্বয়কারী বা agglutinating ও বহুদল বা pollysyllable বিশিষ্ট ভাষা।

কুড়মালি ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

এক) এই ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি মাত্র সাতটি : অ, আ, ই, উ, এ, ও অঁ

ব্যঞ্জনধ্বনি মাত্র ২৯টি, এগুলি হল:

ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, স, হ, ড়, ঢ়, ্ (হসন্ত)

দুই) আনুনাসিক স্বরধ্বনির আধিক্য লক্ষ করা যায়:
হাঁত, হাঁথি, উঁট, চঁ, চাঁ. আঁটা, আঁক (খামারের বহির্পথ), কঁকা, ঝাঁটা, গাঁও, গাঁওলি, ঘাঁটশিলা ইত্যাদি।

তিন) অপিনিহিত শব্দের মধ্যে আগত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে। যেমন— বইস, রাইসভারি, গাইল, রাইত, কাইল, সাঁইঝ, মাইর, পাইর, চইল, কইলকাতা, ঝাইলদা, পাইখ ইত্যাদি।

চার) শব্দের বহুবচনে গা, গিলা শব্দ ধ্বনির শেষ যুক্ত হয়। যেমন: কামিনগা,

গরুগিলা, লোকগুলা।

পাঁচ) কুড়মালি শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ইচ্চারিত হয় না। ফলে পরবর্তী ধ্বনি অনেকটা বিকৃত উচ্চারণ মনে হয়। যেমন : গ্রাম > গেরাম, স্থান > থান, প্রজা >পরজা, স্তন > থন ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

এক) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারকে-কে বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—

জলকে চল, ঘাসকে গেইলছে

দুই) নামধাতুর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

রাইতে জাড়াবেক, জলটা গঁধাচ্ছে, ঘরে চর সাঁধাইছিল, ঘাসের বাসে লভাইল।

তিন) যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—

উঠা করান, আনা করান, কাটা করান, ডরা করান

চার) অপাদান কারকে লে, ঠে-র ব্যবহার। যেমন—

ঘরলে, ঘরঠে, গাছের লে, বনের লে

পাঁচ) ক্রিয়া পদের শেষে 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

কাইরবেক, খাইবেক, খাবেক, মাইরবেক

ছয়) ল দিয়ে অতীত কালের এবং ব সংযোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ দেখা যায়।যেমন—

গেল রঁহ, গে লে রহি, আউ লি,

আট) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গে বাক্যগঠনে বাক্যে কর্তা উহ্য থাকলেও অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন—

গেল রঁহ, পুংলিঙ্গ এবং গেলে রহি স্ত্রী লিঙ্গ।

উভয় ক্ষেত্রেই কর্তা একবচন হওয়ায় ক্রিয়াও একবচন।

নয়) ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়াপদের ব্যবহার থেকে কর্তা উহ্য থাকলেও বাক্যটির পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ বোঝা যায়। যেমন— আউবে, যাবে, খাবে ইত্যাদি পুংলিঙ্গ, যেমন: ক) মর বেটিক বিহায়ঁ আউবে

খ) ইঁত যাবে, খায় লে

আর স্ত্রীলিঙ্গ হলে : আউতি . ক) উ আউতি (পুংলিঙ্গে— এঁই আউবে)

দশ) বট ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

ইটা মিছা কথা বটে, মারকু কাড়া বঠে, ইহেই বঠে দাদার শালা।

কুড়মালি ভাষায় বাক্য বা Sentence হল টুম্, শব্দ বা Word হল সাড়া, বর্ণ হল Alphabet— কড়। কড় বা বর্ণ দু-প্রকার: স্বরবর্ণ হল হহিকড় বা অড়আখড়, আর ব্যঞ্জনবর্ণ হল পাহিকড় বা জড়আখড়। বর্ণমালা হল কড়হালা, আওয়াজ, Voice — রব, ধ্বনি, Sound— ধমস্। মেঘের ধ্বনি, গর্জন বা ডাককে বলে গুড়গুড়াইহেক। বর্ষার রবকে বলা হয় সন্-সনাহেক। ঝমঝম করে বৃষ্টি— ঝমঝমা উহেক, ঝর্ ঝরা উহেক।

এবার ব্যাকরণ অনুযায়ী এই ভাষার বিভাগ দেখানো যায়।

কুড়মালি সাড়া ভাঁড়ার (শব্দভাণ্ডার)

প্রাণীরা তাদের কণ্ঠের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে বুলি বা ডাক বা রব বলে। এই অর্থপূর্ণ রবকে শব্দ বলে। পাশাপাশি কতকগুলো শব্দ বসে বাক্য তৈরি করে। আবার বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। কুড়মালি ভাষায় এই শব্দ এবং পদের সংযোগে যে বাক্য গঠিত হয়, তার ব্যাকরণ সহজেই চিনে নেওয়া যায়। কুড়মালি শব্দে ব্যাকরণের পদ্ধতি বা রীতি (কুড়মালি ভাখিক কড় /সাড়া আর ভাঁউঅর (ব্যাকরণ) কর ধঁচর (পদ্ধতি)। পদকে কুড়মালিতে পাইয়া বলে। প্রচলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে কুড়মালি শব্দের পার্থক্য হল, শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে সাড়া পাইয়াতে পরিণত হয়। যেমন— ছট, ছউয়া, অরা, খেলনাপাতি, ভালবাসা— এই শব্দগুলির সঙ্গে একাধিক বিভক্তি যোগ হয়ে একটি অর্থবোধক বাক্য তৈরি হয়। শব্দ বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ হয় :

ছট— অ(০)— ছট (ছোটো অর্থে)

ছউয়া— রা — ছউয়ারা (ছেলেমেয়েরা)

অরাক— র —- অকর /অরাকর

খেলনাপাতি— গিলা— খেলনাপাতি গিলা (খেলনাপাতিগুলোকে)

ভালোবাসা— থিন— ভালোবাসথিন

সুতরাং কুড়মালিতে বাক্যটি দাঁড়ালো : ছট ছউয়ারা অরাকর খেলনাপাতি গিলা ভালোবাসথিন।

ক. পাইয়া বা পদ প্রকরণ

কুড়মালি ভাষায় পদকে পাইয়া বলে। পদ পাঁচ প্রকার। বাচিক (বিশেষ্য), আউজি (সর্বনাম), লাহনা (বিশেষণ), টিট বা তামান (অব্যয়), সরান (ক্রিয়াপদ)
প্রকৃতিজাত মনুষ্য উচ্চারিত আউয়াজ বা ধ্বনি থেকেই ভাষার জন্ম। মনের ভাব বিনিময়ের জন্য এই ধ্বনির দ্বারা গঠিত সাড়া বা শব্দসমষ্টির দ্বারা গঠিত অর্থবহ যে বাক্য গঠিত হয়, তা থেকেই (কুড়মালি) ভাষা গঠিত হয়। এই সমস্ত ভাষা শুনলে বোঝা যায় কুড়মালিতে প্রকৃতিজাত ভাষার থেকেই অনেক বেশি সাড়ার ধ্বনি সংগ্রহ করা হয়েছে। নিচে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। বাংলাভাষায় যেরকম যুক্তাক্ষর লক্ষ করা যায়, কুড়মালিতে কিন্তু তেমন হয় না। কুড়মালি লিপি নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখাব, কতো সহজে এখানে বর্ণমালায় খঁড়িনেঁগড়ি ২৯ (ঊনত্রিশ) টি হরফের সাহায্যেই সমস্ত যুক্ত অক্ষরকে বোঝানো সম্ভব হয়েছে। কুড়মালি ভাষায় এই যুক্তাক্ষর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণটি না থাকলেও শব্দটি এবং বাক্য অর্থবহ হয়ে উঠতে কোনো বাধা হয় না। অর্থাৎ অর্থবহ ভাবে লেখা বা উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় না। পদ গঠিত হয়। যেমন— হিকড় বা হড়আখড় (vowel) সাতটি তৈরি হয় হরফ থেকে: মঁই, অঈই, এঁই, অঁইএঁ, উ, উএ ইত্যাদি। তেমনি আবার পাহিকড় বা জড়আখড় consonant তৈরি হয় ২৯টি বর্ণদিয়ে। যেমন— কা-কা-কে-কি-কু-কঁ, খ-খা-খে-খি-খু-খঁ।

কুড়মালি ভাষা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে সব শব্দ শুনতে পাই তা থেকেই এর রব এবং সাড়া তৈরি হয়েছে। প্রকৃতি থেকে কিভাবে কুড়মালি শব্দ তৈরি হয়েছে, তার খেহড়ের কথা বা স্বরূপগুলি উল্লেখ করছি। যেমন— মেঘ গুড়গুড়াইহেক। মেঘের ধ্বনি বা ডাককে কুড়মালিতে বলে গুড়গুড়াইহেক; গুড়গুড় করে হেক। বৃষ্টির ধ্বনিকে বলে সন্ সনাহেক। বা সন্ সন্ করে হেক্। ঝম্ ঝম্ ঝমা-উহেক, ঝর ঝর-ঝরা হেক। এবার এরকমই কোকিলের ডাক কু-হু, কুহু, ডাহুকের ডাক কাঁ-হাঁ, কাঁ-হাঁ। তিতির পাখির ডাককে বলে চির-খ-খ, চি-র-খ-খ, বাঘের ডাককে বলে আঃ-আঁ-হাঁ-হাঁ...।

শিয়ালের ডাককে হু-আঃ-হু-ক্-কা, হু-আ-হু-ক্-কা-হু। কুকুরের ডাককে ভু-ভু-ভু। গরুর ডাককে বলে হম্‌লাইস, অর্থাৎ হম্‌মা— হম্‌মা। কাড়ার ডাক এঁ-হে, এঁ-হেঁ। হাঁসের ডাককে পেঁ-ক, পেঁক ইত্যাদি। যেমন কুড়মালিতে কুকুরকে ডাকা হয় আ-তু-তু বলে। এই আ-তু-তু থেকে স্বরসংকোচ ও স্বরসঙ্গতির ফলে তু-তু > কুতু। বাংলায় বলে কুত্তা। যেমন কাড়াকে, গরুকে ডাকা হয় হা-ম্-মা হা-ম্-মা বলে। এর থেকে হামা নামের উদ্ভব।

এই প্রকৃতিজ বা প্রকৃতিজাত নাম থেকে এই অঞ্চলের স্থান নাম পরিচয়ের ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ছাগলকে কুড়মালিতে ডাকে আ-মেঁ-মেঁ বলে। এই মেঁ-মেঁ থেকে মেঁ-মেঁটা নামের উদ্ভব। এবং এর থেকে মেরম। কুড়মালিতে মেরম মানে ছাগল, এর থেকে 'মেরমবেড়া' গ্রামের নাম। এঁরা মৃগ বা হরিণকে বলে হেরিণ। তা থেকে 'হেরণাটাঁইড়' গ্রামের নাম। পাহাড়ী টিলা অর্থে টাঁইড় বা টাঁড়। যেমন ঝাড়খণ্ডের কার্মাটাঁড় < কারমাটাঁইড় থেকে; বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষজীবনে দীর্ঘকাল যেখানে বসবাস করেছিলেন। হাঁসকে কুড়মালিতে 'কড়' বা 'গেড়ে' বলে আর গেড়ের যে বিচরণক্ষেত্র জলাশয়, তাকে 'গেড়িয়া' এবং 'ডভা' বলা হয়। যেমন গেড়ে হাটের কাছে ডভা বা জলাশয় থাকে। জলাশয় অর্থে পুকুর। যেমন ডভা বা ডবা অর্থে পুকুর বা গ্রামের নাম 'ডাবুয়াপুকুর'। এই গেড়ে হাট থেকে গেড়িয়াহাট > গড়িয়াহাট- অনার্য সংস্কৃতির বাহক। এরকম ঝাড়গ্রামের গিধনি বা বাঁকুড়ার 'গিধনিগ্রাম', 'শুকনিবাস' গ্রাম।

আর এক ধরনের শব্দ তৈরি হয় 'লে' বা 'লে-লে', 'লে-ধর' বা 'লে-চ' এরকম দে-দে বা দে-চ; অর্থাৎ দাও এবং চল। এরকম দে-ছাড় বা লে-ছাড় এর অনুসরণে তৈরি শব্দ; জান- কেহনি, শুন-কেহনি।

এরকম পাঁচ প্রকার পদের উদাহরণ:

১। বাচিক বা বিশেষ্য পদ (Noun) : নামবাচক পদই বিশেষ্য। A noun is a naming word. মাঞ, বাপ, খুড়া, মসা, মসি, ফুফু, বেটা, বেটি, নাতি, নাতিন, সালা, বেউনি, জুআনি, বিলাই, খাইট, মেচলা, পিঁড়া, শাঁস, ধোতি, লুগা, হার (হাল), ফার (ফাল), রাইত, দিন, গতর, তন, মন, পাইখ, পাখুড়, দয়া, মায়া, সুখ, দুখ, বিপইদ, হাসা, কাঁদা, গাছ, ভাত, মাড়, থালা, ডুভা, কিষ্ট, রাধা, ননদ, ঘরে, ভাসুর, দেশ, পরদেশ, ধান, গান, মান, চোরি, দাম, কিনা, বেকা (বেচা),

ধন, সম্মতি, বালি, পাথর, (পাখনা), পহোড়, পরবত, পাত, ফর (ফল), ফুল, বিহান, বেসিয়াম, আছবেরা, মাছি, আঁধরা, ভিনসার, সনা, রূপা, পিতর, লহা, চুড়ি, ঢেঁকি, বছর, মাস, মহুয়া কেঁদ, আম, জাম, কঁঠর, উরমাল, নেদি, আরসি, কাঁকই (কঁকই), কাগজ, কলম, হাথি, ঘড়া, গরু, ছাগেইর, পঁঠরু, ভেড়া, কাড়া, গাড়ি, সাইকেল, ঠেকা, পেথিয়া, টুপা, সুপ, সুপলি, পাই, পইলা, টাকা, পইসা, মাছ, মাস, আকাশ, জমিন, পাতাল ইত্যাদি।

২। অউজি বা সর্বনাম পদ (Pronoun) : সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যথা—মঁয়, তরা, তকে, অরাকে, অকর, হামরাকে, হামরা কর, তহরা, হামকে, ই, উ, ইটা, সেটা, অকে, তাকর, তাকে, উটা, মকে প্রভৃতি। তাছাড়া—নিজে, আপনে, কনে, কখন, কাঁহা, কিনা, জে, সে, (জে সহে, সে রহে), এ্যাঁ (য়েঞ), এহেটা, হাউটা, জেটা, এরাও, কনে-কনে, কুছু-কুছু, সভে, সভেটা, দুঅ, দিঅ ইত্যাদি সর্বনাম পদ কুড়মালিতে ব্যবহৃত হয়।

৩। লাহনা বা বিশেষণ পদ (Adjective) : বিশেষণ বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন লাল, লালি, চড়কা, ধবল, ধবলা, ধবলী, কেরিয়া, হেরদিয়া, গোরি, সুখল, নরম, মটা, ছটকা, ছুটু, টুকু, টুএক, লেংড়া, কানা, অন্ধা, বড়কা, বড়কি, ভাল, পাকল, ডেরকা, কাঁচা, জিলি, সঝা, সিধা, লেদা, টেরা, গাদর, মিছা, মাঁচা, সরু, লইতন, পুরনা, বাসি, পচল, চিকন, খরখস্যা, মিঠা, তিতা, তাতল, জুড়্যাল, বহল, ডুবল, ঘুমাইল, দইনিক, সুতল, বেসল ইত্যাদি।

৪। ঢিঁঠ বা ভেঠর, অব্যয় পদ (Conjunction) : সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে লিঙ্গ, বচন ও কারকে যে সমস্ত পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাদের অব্যয় পদ বলে। যেমন— নিত, আর, মিনতুক, বরন্চ, যদি, তাহেলে, কাহেনি, আহা, ছিছি, হায়-হায়, রে, হে, গ (গা), ওহে, ওগো, নাহেলে, নাইহেলে, দ্বারা, দেইকে, লেইকে, লে, বরংগ, যেসন, যদি, কিংবা, পাছে, মতন, উঁহু, ইস্, বাহবা, দুর্, বাহ্, জেজে, তেতে ইত্যাদি।

৫। সারন /করণ বা ক্রিয়াপদ (Verb) : ক্রিয়া পদ বলতে বোঝায় একটি কার্য বা ঘটনা-বাচক শব্দ, ইংরেজিতে ‘that show an action (sign), occurrence (develop), or state of being (exist)’। ক্রিয়াপদ বাক্যের বিধেয় অংশের

প্রধান পদ। প্রতি বাক্যে একটি সংবাদ বহন করে, ক্রিয়া পদ সেই সংবাদের বাহন। যেমন— রাম পঢ়্যে ইস। রঘু ভাত খা ইস। এই দুটি বাক্যে পঢ়্যে ইস ও খা দুইটি ক্রিয়াপদ।

খাওয়া, দেখা, বেচা, কিনা, নাহা, হাঁসা, কাঁদা, কুদা, গিরা, লেখা, পঢ়া, বেসা, উঠা, থিরা, জিরা, হুলকা, চমকা, চলা, কেরা, ধরা, মারা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদ।

খ. সরান বা ক্রিয়াপদের ধঁচর বা পদ্ধতি :

কুড়মালি ভাষার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি রূপ আছে। যেমন— যাওয়া অর্থে জাঁহ, জাইহ, জাম, জাব, যাতাক, জাতা, জাতি, জাহিআ, জাইস, জাহিস, জাহাত, জাবে, জাবাহে, জাইসলা। বচন, লিঙ্গ ও কালভেদে এদের রূপ বদলায়।

ক্রিয়ার কাল : কালকে কুড়মালিতে বেরা বলে। কুড়মালি ভাষারও মৌলিক কাল ৩টি— চলতি, বিতি, আউতি।

বচন, পুরুষ, কাল অনুসারে ক্রিয়াপদের গঠনগত পরিবর্তন হয়। যেমন:

চলতি (বর্তমান কাল)	বিতি (অতীতকাল)	আউতি (ভবিষ্যৎ কাল)
একবচন: মঁই ঘার জাঁহ	মঁই ঘার গেলেরহঁ	মঁয় ঘার জাম
বহুবচন : হামরা ঘার জাইহ	হামরা ঘার গেলেরহিঅ	হামরা ঘার জাব
একবচন : মরবেটা পঢে ইস	হামরা বেটা পঢ়েহেল	মর বেটা পঢ়তাক
বহুবচন :		
হামরাক ছওয়া খেলহত	হামরাক ছওয়া খেললেহেলা	হামরাক ছওয়া খেলতা
একবচন : মকে হুলকেস	মকে হুলকেহেল	মকে হুলকতাক
বহুবচন : হামরাকে হুলকহত	হামরাকে হুলকে হেলা	হামরাকে হুলকতা
একবচন : মকে ডাকেইস	মকে ডাকেহেলাক	মকে ডাকতাক
বহুবচন : হামরাকে ডাকেইস	হামরাকে ডাকেহেলা	হামরাকে ডাকতাক

ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে কুড়মালি ভাষার কতকগুলো নিজস্ব রূপ আছে। এই ক্রিয়ার রূপভেদগুলি নিম্নরূপ :

১। অর্থে বর্তমান, রূপে ভবিষ্যৎ : যদি মার্কসবাদ এত না সুন্দর হেইতেলাক,

তাহেলে, সারা দুনিয়াঁটাঞ কাহেনি পসরাওলেক ?

২। রূপে ভবিষ্যৎ, অর্থে অতিত : অকর আওয়েক কাথা রহেক, মিস্তুক কাহে জেনি আউঅল ?

কাজে বাহরাম ভাবে হেঁল, তখনে হামর বন্ধু আইকে পঁহচল।

৩। রূপে অতীত, অর্থে অবিষ্যৎ : লুগাগিলা উঠাওয়েঁ, পানি আইগেলেক দেখহঁ।

৪। রূপে অতীত, অর্থে বর্তমান : সংসারকে দুখ সাঁভ লাউতে সাঁভলাউতে, হামর জীউটা বাহরাই গেলি।

৫। রূপে বর্তমান, অর্থে ভবিষ্যৎ : রিচিক ডাঁড়ায়ঁ, এখনে আওঅহঁ। সমাজবিদরা যেমন কহলা, তেসনে করবে। তরা কহেইয়া ত মঁয় আওঅহঁ।

৬। রূপে বর্তমান, অর্থে অতীত : চানক্য কেহেই, বিদ্বানরা সব জায়গাঁয় পূজা পাওয়ত।

৭। বর্তমান ক্রিয়াপদের দ্বারা অতীত ঘটনা বোঝানো হয় : যখন সবন্নাখাঁয় বান আউতেক, তখন হামরা গাঁওয়েঁ নি রইহ। অকঁটা অঁয় কিনা ভাবে করেই সাহে, অহেটাই মঁয় দেখেহেলঁ।

গ. লিঁগা (লিঙ্গ Gender)

যে চিন্ হাপ বা চিহ্নের দ্বারা পুরুষবাচক, স্ত্রী বাচক ছাড়াও ক্লীবলিঙ্গ বাচক প্রাণী কে বোঝাতে সাহায্য করে, কুড়মালি ভাষায় তাকে লিঁগা বলে। কুড়মালিতে লিঁগা তিন প্রকার :

১। নরলিঁগা– পুং লিঙ্গ, Masculine Gender

২। মাদি/মেদি লিঁগা– স্ত্রী লিঙ্গ Feminine Gender

৩। হিজরা/লুঠু লিঁগা– ক্লীবলিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ Common Gender

এছাড়া কুড়মালিতে আর একটি লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তাকে ধামাধরা বা লেহরা লিঁগা ইংরেজিতে Neuter Gender বলে।

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের বিচারে কুড়মালিতে বাচিক লিঁগা ও বেবাচিক লিঁগা বলে। যে লিঙ্গের সাহায্যে পুরুষ এবং স্ত্রীকে বাচিক বা নির্দিষ্ট করে বুঝায় তাকে বাচিক লিঁগা বা Definite Gender বলে। যেমন— বাপ-মাঁই, কাকা-কাকি, জেঠা-জেঠী, মামা-মামি, মসা-মসী, ভাই-বেহিন, দাদা-দিদি ইত্যাদি। আর যে

শব্দের দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী কোনোটাই বাচিক করে না বা নির্দিষ্ট করে না বা করা যায় না, তাকে বেবাচিক লিঁগা (Indefinite Gender) বলে। যেমন— মানুষ, পশু, গাছ, ফর, লক্ /লোক, বিহারী, নেপালী, আসামিআঁ, পাখুড়া/পাখি, ছাগের /ছাগল, চিমটি ইত্যাদি। কুড়মালিতে উভয়লিঙ্গকে ধামাধরা বা লেহরা লিঁগা- Neuter Gender বলে। বাংলায় যাকে নপুংসক বলে কুড়মালিতে তাকে লুপুঁগসর বা ঠাকুর লিঙ্গ বলে। যেমন—

ভৈরব ঠাকুর /ভৈরব থান	ভৈরবী মা / ভৈরবী মা চামণ্ডা
গেরাম ঠাকুর	জাহির মাঁই
ধরম ঠাকুর	দিয়াসিনী মাঁই থান
ঢলবুরু ঠাকুর	মহামাই থান

কুড়মালি ও আদিবাসী সমাজে এইসব অপুঁগবাহি ঠাকুরকে ধামাধরা লিঁগা বলা হয়। এই লেহরা লিঁগার প্রত্যয়ের ঢেসনা বা পাইন নাই। কুড়মালি ভাষাতে টা দিয়ে নরলিঁগা আর টি দিয়ে মাদি লিঁগা বা স্ত্রী লিঙ্গ এবং লি দিয়ে মাদি লিঁগা বা হিজড়া লিঁগা বাচিক করা যায়। যেমন—

১। বরদটা চরেই সাহে; লোকটা আউএই সাহে।

২। গাইটি চরেই সাহি; জেনিটি যাই সাহি।

৩। লক্ /লোক গিলি আউলা আর হিজরটা আউলাক বা হিজরাগিলি আউলা ইত্যাদি।

এখানে বরদটা নর লিঁগা, গাইটি স্ত্রী লিঁগা— এইভাবে ক্রিয়ার প্রত্যয় (ঢেসনাগুলিও) লিঁগা চিহ্নিত করে। এবং সংখ্যাটিকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে একবচন বা একলেখা বা বহুবচন (সাঁগি লেখা) বাক্যগুলিতে প্রয়োগ করে বাক্যগুলিকে শুদ্ধ করা হয়েছে। চরতেই সাহি— ক্রিয়াপদের একবচনে লক্‌গিলি আটলা/গেলা বহুবচন এইভাবে লেখা হয়। এভাবে লা, লি, গুলি দিয়ে বাচিক বা চিহ্নিত করে।

কুড়মালি ভাষাতে বাক্যে কর্তা উহ্য থাকলেও, ক্রিয়ায় প্রত্যয় যোগে কর্তার লিঙ্গ নির্ণয় অতি সহজেই উল্লেখ করা হয়। যেমন—

কর্তা উহ্য রেখে বাক্য গঠন :

১। আউ এই সাহে।

২। আউ এই সাহি।

উভয়ক্ষেত্রে কর্তা স্ত্রী কি পুরুষ উহ্য। তবু সহজেই সাহেতে পুংলিঙ্গ এবং সাহিতে পুংলিঙ্গ বোঝানো হয়েছে। বাংলায় এভাবে বোঝানো যায় না। কুড়মালিভাষী কুর্মি সম্প্রদায় মনে করেন এভাবেই বাংলা ভাষার থেকেও কুড়মালি ব্যাকরণগত শুদ্ধ, আদর্শ ও প্রকৃতিজাত ভাষা।

নিচে সাধারণভাবে নরলিঁগা ও মাদি লিঁগার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

পুঁ/নর	স্ত্রী/মাদি	পুঁ/নর	স্ত্রী/মাদি
বাপ	মাঞ	মেঝল্যা	মেঝলি
ফুফা	ফুফু	মরদ	মেহরারু /জেনি
এঁড়িয়া	বকনা, বাঁছি	দাদা	ভউজি
ষাঁড়	ফেট্যান	মোসা	মোসি
ছঁড়া	ছঁড়ি	দেবর	দেওরানি
শ্বশুর	সাস/সাউড়ি	কাড়া	মইস/ভঁইস
কাকা	কাকি	বদা	পাঁঠি
পিসা	পিসি	বহনই	বহিন
নানা	নানি	ছটকা	ছটকি
সমধি	সমধিন	মুরগা	মুরগি
মালিক	মালকান	নেংটা	নেংটি
বর	কেনিয়া/কনিঅ	মোটা	মোটি
বড়কা	বড়কি	মাহাত	মাহাতান
ধবা	ধবিন	সাঙ্গাত	সাঙ্গাতিন
লাপিত	লাপতাইন	ফুল	ফুলিন

ঘ. লেখা (বচন, Number)

কুড়মালিতে বচন দু-রকমের : এক লেখা (একবচন, Singular Number), সাঙি লেখা (বহুবচন, Plural Number)

একলেখা	সাঙি লেখা
মঞ	হামরা

অকে	অরাকে
গরুটা/গরুটাকে	গরুগিলা, গরুগিলিন
রামেক	রামবাকর
চইতাকর	চইতারাক, চইতারাকর
হামর	হামরা, হামরাকর
তারিআ	তারিআগিলা

কুড়মালিতে একবচন নির্ণয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:

এক। শুধুমাত্র শব্দটি লিখে বোঝানো যায় : মঁয়, তঞ, চাঁদ, সুরজ, ধরতি, গঙ্গা, তাজমহল, হিমালয়, ভুরকাতারা, ধ্রুবতারা, এভারেস্ট, সরগ।

দুই। শব্দের আগে এক বসিয়ে: এক পইসা, এক দুয়াইর, এক দেশ, এক জাতি।

তিন। শব্দের শেষে টি বা টা বসিয়ে: ছোওয়াটা, ঘড়িটা, বাড়িটি, বৌঁঠিনটা, কলমটা, গরুটা, সুরজটা, মুরগিটি।

চার। অনেক সময় একবচন বোঝানো হয় গটা/গটেক শব্দ বসিয়ে :

গটা বছর কাম করিকে, গটেক লুগাউ নি পাঁওলঁ।

বহুবচন করা হয় লিম্নলিখিতভাবে:

এক। শব্দের আগে একের অধিক সংখ্যা বসিয়ে। যেমন— দুইঅ পাঁঠি, তিনটি বহু, দপথি (দুজন ঝগড়া করে, শুনে পঞ্চাশ জন), চৌমাথা, পাঁচমাথা, নটাগরহ, দশ দুয়ারি, শতনখ, হাজার দুয়ারি।

দুই। শব্দের আদিতে বহুত, দমে, বেজাঞ, বেশি, জড়া, সাঙি প্রভৃতি শব্দ যোগ করে। যেমন— দমে লক, বহুত আদমি, বেজাঞ আম, সাঙি বেরিয়াত।

তিন। অনেক বেশি বা অধিক বোঝাতে কুড়মালিতে এই শব্দ যোগ হয়: গঠ (গোঠ), মন, খাতা, গাদা, দল, দমতক, একডাব, সভে, যতনা, কতনা, অতনা ইত্যাদি। যেমন—

সভে মিলিকে কাম কেরে হেতি

একগঠ ভেড়ি আওয়হত।

যতন চিনি অতনা মিঠা

যতনা দিন যাতেক অতনা খালে ?

গাদা আম ইত্যাদি।

চার। একই শব্দের দু-বার বা দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা। যেমন— উঁচা উঁচা, ঘার ঘার, ডাইরে ডাইরে, গাঁওএঁ গাঁওএঁ, জড়া জড়া, চড়কা চড়কা, কনে কনে, গাদর গাদর।

পাঁচ। অনেক সময় সম্মানার্থে একবচনে বহুবচন ব্যবহৃত হয়: মামা, অরাকেট আনবাহন। মাঞ, তবাকে যাই হেতন।

ছয়। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে খঁড়, ডিং, কুটিয়া, মুড়, চেটা প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে একবচন বা বহুবচনের রূপ দেখা যায়। যেমন— এক খঁড় লুগা, এক কুটিয়া মাস, এক মুড় গাই, চার ডিং গবর, এক কুটিয়া মাস, দশ খঁড় লুগা, সাত মুড় গাই ইত্যাদি।

সাত। কুড়মালিতে অনেক সময় 'মেলা' শব্দের দ্বারা বহুবচন বোঝানো হয়: যেমন—

মেলা লক কিরতন শুনি যাতাক বা মেলা কাম বাকি আছেক ইত্যাদি।

৬. সমাস

কুড়মালি ভাষায় সমাস অর্থভেদে আসলে ৪টি— দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি। আর দ্বিগু ও কর্মধারয় আসলে তৎপুরুষের মধ্যেই পড়ে। অন্যান্য নিয়মকানুন বাংলা ব্যাকরণের মতোই।

দ্বন্দ্বসমাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়:

এক। বিশেষ্যে-বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব সমাস যেমন : ভাই বহিন, দাইলভাত, কাকা জেঠা, মামা ভেগিনা।

দুই। বিশেষণে বিশেষণে হয়, যেমন— লালা নীল, রুগা পাতলা।

তিন। সর্বনামে সর্বনামে হয়, যেমন— তঁয় মঁয়, যাখে তাখে, যে সে।

চার। ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব, যেমন— লেন-দেন, রহন সহন, যাওয়া আসা।

পাঁচ। দুটি সমার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব হয়, যেমন— কাজকাম, ধরপাকড়, কুটুমবাটুম, খালিপতরি, টাকাপইসা, দানাপানি, হাটবাজার, মাঠময়দান, বাউবাতাস, খজখবর ইত্যাদি।

ছয়। বিপরীতার্থক শব্দ যোগে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, যেমন— ঠিকবেঠিক, ধনি নিরধনিয়া, বকা চালাক, সুখ দুখ, রুখা তেলুআ, ঢঙ বেঢঙ, গটা খাঁজা, আগু পেছু, আসমান জমিন, সাঁঝ বিহান, কাঁদল হাঁসল ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদ বিভিন্ন বিভক্তি লোপে সমাসবৈচিত্র্য অনুসারে :

এক। পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপে, যেমন— ঘরকে সাফাই = ঘর সাফাই, এরকম- ধান কাটাই।

দুই। পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি লোপে, তাস সঁয় খেলা= তাস খেলা; এরকম সেনুর লেপন, ঢেঁকি ছাঁটা, দাকাটা, মধুমাখা ইত্যাদি।

তিন। পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি লোপ, যেমন— মাল রাখেক কে গুদাম = মালগুদাম, বিহাকে লাগি পাগলা = বিহাপাগলা, এরকম ধানজমি, গাড়িভাড়া ইত্যাদি।

চার। পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপ: বিলাত সে ফেরতা= বিলাত ফেরতা , জনম সে অন্ধা= জনমঅন্ধা ইত্যাদি।

পাঁচ। পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে, যেমন— কাড়ার লগে গহ্যাল= কাড়াগহ্যাল, গরুর লগে বাথান = গরুবাথান, এরকম ফুল বাগান, পখইরঘাট, ফুলবাগিচা ইত্যাদি।

ছয়। পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি যোগে, যেমন— রাইত লগে জাগল (পাইখ)= রাইত জাগল, রাইত খনে কানা = রাইত কানা, এরকম কানফুসড়ি।

বহুব্রীহি সমাস : বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদগুলি হল:

এক। ব্যাধিকরণ নহুব্রীহি : বীনাপানিকে যাকর= বীনাপানি।

দুই। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : কান কাটল যাকর = কানকাটোয়া, দুঃবুদ্ধি যাকর= দুর্বুদ্ধি, খুশি মেজাজ যাকর = খুশমেজাজ ইত্যাদি।

তিন। ব্যতিহার বহুব্রীহি : লাঠালাঠি, কাটাকাটি, হাতাহাতি ইত্যাদি।

চার। সমাহার বহুব্রীহি : পাঁচটা আনন যাকর = পঞ্চানন

পাঁচ। নঞ বহুব্রীহি : নাই ডর যাকর= নিডর, নেখে ইমান যাকর = বেইমান ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস হয় নিম্নলিখিত ভাবে :

এক। সাদৃশ্যে : বন লেখেন= উপবন

দুই। সমীপ্যে : কূলেকের সমীপ = উপকূল।

তিন। অভাব : ভিক্‌কের অভাব = দুর্ভিখ।

চার। বীপ্‌সা: দিনকে দিন= দিন দিন, রোজ রোজ = হররোজ

পাঁচ। যোগ্যতা : রূপকের যোগ্য= অনুরূপ।

ছয়। অনতিক্রম : বাতকে অতিক্রম নি করিকে= বাতমোতাবেক।

সাত। বৈপরিত্য : কার (কার্য) কর বিপরীত=প্রতিকার।

আট। পশ্চাত : তাপ কর পশ্চাত= অনুতাপ।

নয়। ক্ষুদ্র সাগর : উপসাগর।

চ. ঢেসনা (প্রত্যয়: Suffix)

কুড়মালিতে যে শব্দাংশ ধাতু (ক্রিয়া) ও প্রতিপাদকের (বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের) সঙ্গে যোগ করলে নতুন নতুন শব্দ গড়ে উঠে, তাই হল প্রত্যয়। যেমন— গম (ধাতু)+ক্ত= গত, মনু প্রতিপাদিক + ষ্ণ= মানব, দহি + ওয়ালা= দহিবালা ইত্যাদি।

প্রত্যয় দু-রকমের, কৃত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।

এক। কড় বা কড়গুলান ধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নুয়া সাড়া বা নতুন শব্দ গঠন করে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন— কৃ+অন= করণ, পড় + উয়া= পড়ুয়া, চল+অন্ত= চলন্ত ইত্যাদি।

বিশেষ্য বোঝাতে কৃৎপ্রত্যয় হয় অ. আ, তি, ওয়া, ইয়া, আইত, হার, আইক প্রত্যয় যোগে। যেমন— নামঅ, তেলতেলিআ, গেরুয়া, ফকটিয়া,

বিশেষণ নোঝাতে— তি, উয়া, উ প্রত্যয়। যেমন— ধরতি, আগুয়া, পেছুয়া, হারুয়া, চালু, বাড়তি, উঠতি ইত্যাদি।

ক্রিয়ারভাব বোঝাতে— আই, নি, আয়, আই, ই, উয়ই প্রত্যয়, যেমন— লাগাও, মাগাও, ধোলাই, লাচনি,

ভাব, কর্ম, কহ বাচ্যে না-প্রত্যয়। যেমন— বাটলা, খেলনা, ঢাকনা ইত্যাদি।

দক্ষ বোঝাতে আরি, এন, ঐয়া প্রত্যয়। যেমন— গায়েন, বায়েন, ধুয়ানি, বাজৈয়া, নাচৈয়া ইত্যাদি।

দুই। কড় বা কড়গুলান যখন বাচিক বা লাহনা সাড়া (বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন সাড়া গঠন করে, তখন তাকে তদ্ধিত প্রত্যয়

বলে। যেমন— সুখ+ইন= সুখী, গুরু+ত্ব= গুরুত্ব, গঙ্গা+এয়= গাঙ্গেয়, জুইত+সই= জুইতসই ইত্যাদি।

এরকম : জল+উয়া= জলুয়া, রোগ+উয়া= রোগা, গদা, রসা। গোয়াল+ আ= গোয়ালা, পাগল+আ= পাগলা, কালুয়া, ভালুয়া কেবলা, ভজা।

রামুআ, বুধুআ, ছুটুআ— আদর অর্থে।

ই-প্রত্যয় যোগে— পাটনাই, ঢাকাই, কাশ্মিরি, রেশমি, বেগনি ইত্যাদি।

অধিবাসীঅর্থে: নেপালি, ভূটানি, বিহারী, ঝাড়খণ্ডী ইত্যাদি।

প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য থেকে বিশেষণে বা বাচিক থেকে লাহনায় পরিবর্তিত হয়।

যেমন—

জল— জলুআা, ঘর— ঘরুআ, চারি— চারিআ, গান— গাঐয়া, খোস— খৌসাহা, দাম— দামি, দেশ— দেশী, ধান— ধানী, বালি— বালিয়া, কালি /কালঅ— কালিয়া /কাল্যা /কাইল্যা, ঝগড়া— ঝাগড়াহা /ঝাগড়াহড়া (ঝগড়াটে), হাঁঠু— হাঁঠুআল (হাঁটুআ), বাজার— বাজারিআ।

আনা প্রত্যয় যোগে— বাবুআনা, মালিকানা, মুন্সিআনা ইত্যাদি

দান— বাতিদান, ধূপদান, ঋণদান, গোদান, কুড়দান ইত্যাদি।

খানা— জেলখানা, দাবাখানা।

দার— জমাদার, ব্যবসাদার, খরিদ্দার, বাজনদার, দেনাদার, মালদার ইত্যাদি।

বাজ— দলবাজ, চালবাজ, ধোকাবাজ, রগবাজ, দাগাবাজ ইত্যাদি।

গিরি— নেতাগিরি, দারোকাগিরি, বাবুগিরি, দাদাগিরি ইত্যাদি।

বালা বা ওয়ালা— দুধবালা, মাছওয়ালি, গাড়িবালা, টাঙ্গাবালি ইত্যাদি।

কুড়মালিতে বিশেষণের 'তর' বা 'তম' হয় না। দুই বস্তু বা ব্যক্তির তুলনা করলে 'লে' আর অনেকের মধ্যে তুলনা করলে 'সউবলে', 'সবলে', 'অবুলে' সাড়া বা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ছ. উপসর্গ (Prefix)

যে শব্দাংশ শব্দের প্রথমে যুক্ত হয়ে মুখ্য অর্থের পরিবর্তন সাধন করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন, বেসরম, বেগতিক, অনুমান ইত্যাদি। এই বে, অনু, অপ ইত্যাদি হল উপসর্গ। কুড়মালিতে এরকম অনুসর্গ যোগে সাড়া বা শব্দ গল:

পর : পরবাসী, পরদেশ, পরখাকউ, পরপাঁচিয়া।

পরা : পরাজয়, পরাধিন।

অপ : অপমান, অপযশ, অপকার, অপহৃত।

নির্ : নির্ভয়, বির্দোষ, নিরঘিনা, নিরজন।

আঃ : আজন্ম, আজীবন, আদান।

অ : অগম, অকলঙ্ক, অধিকার।

পরি : পরিজন, পরিণাম।

অন : অনপড়, অনজান।

আধ : আধপড়া, আদবাটি . আধসিদ্ধা, আধকূলা, আধছিঁড়া।

ভইর : ভইরপেট, ভইর যৈবন, ভইর খরি, ভইর তাক।

ভউর : ভউর রোদ, ভউর নাচ।

আঃ : আকাল, আনাড়ি, আফাইত।

স : সদুইত, সজাগ, সফল।

কু : কুপুইত, কুমতলব, কুকাজ।

সু : সুপইত।

হর : হররোজ, হরদিন, হরকাম, হরবকত, হরদম, হরঘড়ি।

কম : কমজোর।

বে : বেশরম,বেইজ্জত, বেনাহক, বেইমান, বেকামিয়া, বেদম, বেসামাল।

বদ : বদমাস, বদনসিব।

বিন : বিনদেখা, বিনকাম।

জ. কুড়মালিতে দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভাযা

এখানে সাতদিন, ছয়মাস, গণনা ও মাপের পদ্ধতি কুড়মালি ভাষায় যেভাবে বলে তা সংগ্রহ করা হল। যদিও গ্লোবালাইজেশনের ফলে এর অনেক ভাষাই আজ ইতিহাস।

চাঁদবার : সোমবার

খরঅবার : মঙ্গলবার

জ বার : বুধবার

ডেনিবার : বৃহস্পতিবার

মুরকাবার: শুক্রবার

ভাঙ্গাবার : শনিবার

বেরাবার : রবিবার

মাসের নাম, কুড়মালিতে ৬টি মাস, তাই দিনের সংখ্যা বাংলা মাসের দ্বিগুণ। ছয় ঋতু অনুযায়ী ছয়টি মাস। বসন্তকাল দিয়ে মাসের শুরু। মোট ছয় মাসে ৩৬৫ দিন।

মাসের নাম	দিনের সংখ্যা
মধুমাস/বিহামাস	৬১
নিরনমাস/ধরনমাস	৬১
চাষেক মাস/রূপা মাস	৬১
ভাদর মাস/টানেক মাস	৬২
কাটেন মাস/অঘন মাস	৬১
জাড়েক মাস/জাড় মাস	৫৯

সংখ্যাগণনা পদ্ধতি

এড়ি/এড়ি/এঁড়ি (অনা)	এক-১
দড়ি/জড়ি জোড়ি (দনা)	: দুই-২
ঘুরিয়ন/ঘেরি/ঘুরন (টেনা)	: তিন-৩
চাইল/চৌকি/চক্কা (চোরা)	: চার-৪
চমপা/পনজা/পঞ্জা (মাচা)	: পাঁচ-৫
ছেগ/ডেগ/ডেগা (ছেই)	: ছয়-৬
সতেল/সুতই/সতেল (গেই)	: সাত-৭
আইনটাল/আংড়ি/আঁগড়ি	: আট-৮
নেমি/নেংড়ি/নেঁগড়ি	: নয়-৯
ধেমি/বাংড়ি/বাঁগড়ি	: দশ-১০

নমের গণনায়: অনা, দনা, টেনা, চারা, মাচা, ছয় /গয়, আংড়ি, নেংড়ি, বাংড়ি প্রচলন ছিল।

মাপের পদ্ধতি

৪ মুইঠ = ১ চেটুআ

৪ চেটুআ = ১ পুআ

৪ পুআ = ১ সের (কনা)

৪ সের = ১ পইলা (পাই)

২০ পইলা= ১ খঁড়ি

২ খঁড়ি = ৪০ পইলা

৪০ পইলা= ১ কাঠ (মন)

১০ কাঠ = ১ বাঁইধ

১০ বাঁইধ = ১০০ মন

ঝ. ধাঁধা

কুড়মালি ভাষায় ধাঁধাকে বলে জানেকহলি (Riddle)। গ্রামের সাধারণ মানুষেরা মুখে মুখে এই ধাঁধা বানায়। সরস ও চমৎকার, নির্মল আনন্দের রসদ যোগাতে জানেকহলি তুলনাহীন। ছোট বাচ্চাদের আনন্দদানে এবং মগজের বুদ্ধি বাড়াতে অদ্বিতীয়। সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনে জানেকহলি গুরুত্বপূর্ণ।

১। একটু খানি গাছে, রাঙা বউটি নাচে।

২। রাঙা রাতা, উহুত মাথা।

৩। কাঁচায় লদবদ পাকায় সিঁদুর / যে নাই জানে তার গুষ্টি উঁদুর

৪। ঠুরকু মামুর ঢাঙা পাঁজ।

৫। জান কেহনি জান, নেজে ধরি টান।

৬। থাপড় জমা টুসকি খরচ, বাকি রহিল কত ?

৭। দুই বহিন কালি, পাদে আলাপালি।

৮। ঢাঙা মামার পঁদ কানা।

৯। মাথা রাখ্যে জল খায়।

১০। মরল লকে জিঅ খায় / মনসারামেক কাঁধে চঘি যায়।

১১। এক থারা (থালা) সুপারি, /গুনতে লারে বেপারি।

১২। উপরে খঁধা, হেঁটে ডিম।

১৩। টিপিক টিপিক যায়, নেজে আহার খায়।

১৪। হচুক ডুবুক চড়ই পাইখ, চইখ আহেত ত মাথা নাই।

১৫ ।দিছে ত আনিস্ না, না দিছে ত আনিস্ ।

১৬ । মুনা চুকা ধলুকা ।

১৭ । রিং রিং রিং তাকর দু ইটা শিং ।/পাখ লইহ পাখুড় লইহ, ভুঁয়ে পাড়েই ডিম।

১৮ । বনেল্লে বাহরালি হাঁস /হাঁস কহেয় মর শুধাই মাস ।

১৯ । এক গাল খায়, পেছুআঁই পেছুআঁই যায় ।

২০ । সিঁ-রে সিট্‌কা, ভুঞে পটকা ।

২১ । ধর‍্যে, দিল ভর‍্যে ।

২২ । হাঁটে আর চাটে ।

২৩ । চিক চিকা ভুঁই নিকা, তার দাম চোদ্দ সিকা ।

২৪ । মামার ছাগল, ছুলেই মেমাঁয় ।

২৫ । ঝাঁগুড় ঝঁগুড় ঝাঁগুড়, বাপ থ্যাকতে বেটার কেনে নেগুড় ?

২৬ । আট পা ষোল হাঁটু, মাছ ধরতে যায় লাঠু ?

২৭ । একটুকু কানি, শুখাতে নাই জানি ।

২৮ । তিন শিঙা তিরিং রিঙা, পাত রাঙা ফল খাঙা ।

২৯ । কাকা হে কাকা, বীজ বাহির ফল পাকা ।

৩০ । এতটুকু ডালে কিষ্ট ঠাকুর দলে ।

৩১ । ঢাক ঢোল ভিতর খোল, নিংড়ালে পড়ে ঝোল ।

৩২ । ঝিক ঝিক মানিকের ফঁটা, ঐ ফুলটি পালি কুথা ?
রাজার ভাঁড়ারে নাই, কড়ি দিলে মিলে নাই ।

৩৩ । মামা মায়ে বিটিকে গড় করে ।

৩৪ । ছট নুনুক গড়ধওয়া পানি সবাই খাত্ ।

৩৫ । ইঘর যায় উঘর যায়, আগুড় কুনে কাচাড় খায় ।

উত্তর : (১) লাকাঁ, (২) মোচা (কলার), (৩) হাঁড়ি ,(৪) সিঁকা-বেহঁগা, (৫) বেগুন, (৬) আঠ, (৭) চাপুআ (হাপর), (৮) সিঁকা, (৯) ডিবরী (লমফ), (১০) ঘঘি, ঘুঘি (মাছ ধরার), (১১) তারিয়া (তারা), (১২) মহুয়া (মহুল), (১৩) সুঁচ (ছুঁচ), (১৪) খাঁকড়ি (খাঁকড়া), (১৫) মই ,(১৬) বেইগন (বেগুন), (১৭) ঘঁঘা, (১৮) ছাতি (ছাতু), (১৯) দড়ি (পাকান), (২০) সিঘন, (২১) জুতা, (২২) শামুক (গেঁঢ়া), (২৩) কোদাল, (২৪) হারমোনিয়াম /মাদইল, (২৫) ব্যাঙ পহনা (ব্যাঙাচি), (২৬)

মাড়শা, (২৭) জীউ (জীভ), (২৮) পানিফল, (২৯) ভেলুয়া (ভালা), (৩০) তেঁতের (তেঁতুল), (৩১) আঁখ, (৩২) ছল (শিল), (৩৩) হাঁড়ির খাপরা, (ভাতের ফেনা ঢালা ঢাকনা), (৩৪) লঢ়ি (নাড়া), (৩৫) ঝাঁটা।

ঞ. আহনা (প্রবাদ- Proverb)

কুড়মালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রবাদগুলি। আবার এই প্রবাদের মধ্যে দিয়েও কুড়মালি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এই সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতিকে জানতে প্রবাদগুলি অপরিহার্য।

১। বিহা কেরেতকে কড়ি
আর ঘার কেরেতকে দড়ি।

২। পচা মরিচেক দর যেসন
দু ধাঁউ বিহাক বর তেসন।

৩। বিহা বাকি যতদিন
নেখা পঢ়া ততদিন।

৪। ঝি জব্দ শিলে
বউ জব্দ কিলে।

৫। আতাতুরা দিহা
পরেক লগনে বিহা।

৬। চিতা মজলেই গীতা
মন মজলেই মিতা।

৭। ঘিউ-এ ভুঁজল নিমপাত
নিম নি ছাড়েই আপন জাত।

৮। কাড়া মরেই হদে
মানুষ মরেই মদে।

৯। কুঁঢ়া খাইকে মরলঅ বাপ
তাকর বেটাক বিত্তাপ।

১০। কেরিয়া কুদরা বাড়িক ভূত
খুখড়ি দেলেই চাপচুপ।

১১। কল কুড়মি কড়া
বেদ বিধি ছাড়া।

১২। শিং সরু নেজ মটা
এসন গরু না কিনসিক বেটা।

১৩। আপন বুইধে তরি
পরেক বুইধে মরি।

১৪। জাকর কড়ি তাকর ঘড়ি
নি কড়ি আকর ঘেচাঞ দড়ি।

১৫। মামা ঘরা খাই, চালেয় লেঠা জানি নাই।

১৬। বাম শিয়ালি ডাইন সাপা।

১৭। আঁখ খাবার খা, ডাঁড়ি গু নবার কে ?

১৮। রিতালে গীতা, না হলে বিষপিতা।

১৯। লইতন লইতন ললিতা, পুন্না হলেই বিষপিতা।

২০। চইখ থাকতে ডেমায় কাজল।

২১। গলা করতে করতে ডেঁহগা।

২২। অঝা ঘরে ঢেঁকি, অঝা মরে রেঁকি।

২৩। ভাঙা জুয়াইল বড়ামশাল।

২৪। ঠাকুরেরলে বদার জাহিরা বেশি। (কদর, দাপট)

২৫। থাক বগলি হামার আশে, হামি আসব কাত্তিক মাসে।

২৬। শ্বশুর ওঝা, বউ কেনে বাঁঝা

২৭। সুঘড় কনিয়ার অসাজন্ত বর।

২৮। আঁড়্যা গরু ? ন টানে দু।

২৯। আঁচে পিঠা, চটে চিড়া।

৩০। আধড় কুকুর বাসাতে ভুঁখে।

৩১। উবগারিকে বাটে মারা।

৩২। বিহা ঘারে মাড় ভাত।

৩৩। পাঁশ কাড়তে ভাঙা কুলা।

৩৪। বাঁঝি কি জানে কাঁজির মরণ।

৩৫ ।বিটি ছানার বাইড়, আর করল বঁশের বাইড় ।
৩৬ ।নাচে কুদে বরিয়াতি, যার লাগে কড়ি পাতি ।
৩৭ ।পাহাড় কচার চাষ, না করিহ্ আশ ।
৩৮ ।তাঁতির কুকুর মাড়ে উসৎ । (কৃতার্থ, খালাস, দায়মুক্ত)
৩৯ ।চালের ডিংলা চালকে উশাস্ ।
৪০ ।উশাস মাটি বিরালে ধুনে ।
৪১ । খাটুয়াকে ভগবান নাপুয়া ।
৪২ । নাচারি বাঘ খাঁকড়ি খায় ।
৪৩ ।কেঁড়রই-এর একটা ঠেঙ ভাঙলে নাই বাতায় । (কেন্নো)
৪৪ । জুয়ান রাঁড়ি জুয়ান ছাড়ি, দুটাই হতচ্ছাড়ি ।
৪৫ ।লাপিতের ঠেও ছাপিত ।
৪৬ ।গাছের ছাহা, মানুষের রাহা ।
৪৭ । ই-দিকে টিকাফকা, ঘরকে গেলে মহুল ভাজা ।
৪৮ ।জিসে নাই তিসে দড়, ধান ভাঙতে হরবর ।
৪৯ । মুড়ি আর ভুঁড়ি, ই গিলাহ্ কাজ দেয় ।
৫০ ।চিউড়া কহেঁ মুড়ি কহেঁ, ভাতেক পারা নিহি,
মোসি কহেঁ ফুফু কহেঁ মায়েক পারা নিহি ।

ট. সমার্থক শব্দ (Synonyms)

চুইল : কেশ /বাল
আঁইখ : চইখ, লচন, নয়ন
মুঁ : মহড়া, মুঁহ
গইড় : ঘইড় /ঠেঙ্গ
দেহ : শরীল, গা, তন, অঙ্গ, গতর, বদন
বাসাত : বাউ, হাওয়া, পবন
পাহাড় : পরবত, গিরি, শিখর
পানি : বারি, অম্বু (বু)
ঘার : ঘর, গিরহ

বাট : ডহর, রাসতা, পথ, লিক, সড়প
লর :চইখেক্, পানি, অশ্রু
আসমান : গগন, আকাশ
সুরজ : রবি, অরুণ, তপন, ভানু, সুরুজ
চাঁদ : সোম, বিধু, ইন্দু, শশী
পিথিম : মেদিনী, ধরণী, ধরতি
ধবলি : সাদা, চড়কা, হাঁসা, হাঁসি, ধবলা, ধব
(রবি, অরুণ, তপন, ভানু প্রভৃতি শব্দ কুড়মালি নামকরণেও পাওয়া যায়।)

ঠ. বিপরীতাথক শব্দ (Antonyms) (উলট্ মাড়া)

অদা : সুখা, সুখল
আলআ : আঁধার, আঁধারিয়া, আঁধরিয়া
আসমান : জমিন
আগু : পেছু
উঠা : গিরা, ডুবা, বসা, নামহা
উতর : দখিন
উপর : হেঁট, নামঅ, তল
উপরিয়া : ভিতরিয়া
ইটা : উটা
ইকাল : উকাল, সেকাল, পরকাল
কাঁদল : হাঁসল
কাঁদা : হাঁসা
কানালি : বহাল, শোল
কুলুপ : চাভিকাঠি, কুলুপখাড়ি
খঁদড় : ফাদা, অইল-ফইল
খঁসা (খলা): লাগা
গটা : খাঁড়া, ভাঁগল
গাজাড় : ফাদা

গরম : ঠানঢা, জুড্যাল

গুরু : চেলা, ভক্ত

ঘিসটা : সুখড়, সাফা

চঘা : নামহা

চড়কা : কেরিয়া, কালিআ

চড়হা : নামহা, উত্‌রা

চিকন : খরখস্যা, খরখস, খেসখেসিয়া

টুকু : দমে, দমতক, ঢেইর, বেশি, গাদা, বেজাঞ, বেদম

ঢঙ : বেঢঙ, বেঢভিয়া, ছেবলা

ঢাঙা : ঠুরকা, বাসনা

ঢিলা : আঁট

ঠিক : বেঠিক

ঠেঁগা : পইনা, সিটকা, চাঙুক

তাতল : কাল্‌হা, জুড়্যাল

ধনি : নিরধনিয়া

তিত্‌কি : লুআঠি

নেগা : দাহিনা

নিদাল : জাগল

পর : আপন

পাশ : ধুর

পুরব : পছিম

বড়কা : ছটকা, সানঅ, চুনু, ছুটু

বকা : চালাক

বিদ্বান : মুরুখ

বাঁধা : খঁসল, ছাড়া

বাঁকা : সঝা, উজা, সরল

বাহির : ভিতর

বেসিয়াম : আড়বেরা

ভারি : হলকা, হালকা
মরা : বাঁচা, জিঅঙ্গত
মরণ : বাঁচন
মারা : আদর
রগা : মটা
রুখা : তেলুআ, তেলতেলিআ, ভিজল
লইতন : পুরনা, পুন্না
সকত্অ : সঝা, নরম
সুখ : দুখ, কসট্অ
সাফা : মইলা, মেইলাল
সুতল : বেসল, বসল
ভাল : মনদঅ, খারাপ
লেখা : পড়হা
হাড় : মাস
দৌড়ল : ঠড়হুআল, ডাঁড়াল
স্বাধিন : পরাধিন, অধিন

ড. আনুনাসিক শব্দের প্রাচুর্য

কুড়মালি ভাষায় আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। যেমন— আঁক (খামারের বাহির্পথ), আঁটা, ইঁট, উঁট, কঁকা (কঁকা ছানা মায়েরও দুধ পায় না), কঁড়চ, কুঁই (কূপ), কুঁয়া, কুঁড়চি (কূটজ), ছাঁইর(ছাঁহিরা), গুঁড়ুর (গরুড়), জঁটা, বাঁহি (বাহু), বাঁসা (বাসা), আঁট (ঘাঁস কাটা কঠিন আঁটের কাজ), চাঁড়ে (চাঁড়) (দেখা পালে বইলবে চাঁড়েই আইসতে), রেঁঘা (একগুঁয়ে), কেঁটরা (কৃপণ), চেঁদরা (রাঁগাই গেল গো তোদের জামাই চেঁদরা), খেঁচরা (উত্যক্ত করা), ঝঁকর (বাড়িবাটে ঝিঙা ঝাঁকরল সজনি), খুঁদি (খুঁদিঘর), দাঁতড়া, মিহাঁ, হাঁতি, চাঁ, দআঁ, কেঁদরী, কুঁদা (কুঁদা বাঘ), খাঁয়েছিস, খাঁকড়া, খাঁকড়াবিছা, গাঁওলি, ঘঁসড়া, চছচরা, জাংলা, জয়াঁ, ঝঁকমারি, তঁই, ধাঁগড়, রাঁকা, বাঁকা, ভেঁড়রা, গুঁইসাঁই, হাঁকড়া, সাঁকট, তুঁপা (মাটিতে পোঁতা), তুঁই, তুঁবা, ঘঁড় ঘঁড়, ঘঁড়র, ঘঁড়া, ঘঁসা,

খঁচ, কঁকলা, কঁচি, কঁঢ়হ, কঁথা-কুঁথি, ডঁড় (কম সময়ে, জরিমানা), উঁডরা, ডঁড়গা, ডাঁঢ়া, ডাঁসা, পঁগা, পঁটা, পঁইচা, পাঁজ, পাঁড়রা, পাঁকুয়া, পাঁজর, পাঁজা, পাঁতড়া, পাঁতা, পিঁদাড়, পঁড়, ফঁটা, ফঁপরা, বাঁঝা, বাঁটা, বাঁধু (বেঁটে), বাঁড়ি (লেজকাটা), বাঁদাপন, বাঁশল্যা, বাঁহুক, রেঁঘা, রেঁচড়া (আঁচড়কাটা), শঁল্‌ল (সজনে), হিঁসকা, হিঁসা, হিঁসাব, হুঁকরা, শঁশা (খরগোশ), চঁচ, চাঁচ, চঁটরা, চঁহরি, হাঁতড়া, হাঁকড়া, হিঁচড়া প্রভৃতি।

চ. কুড়মালি ভাষায় এক বর্ণের শব্দ

কুড়মালি ভাষাতে কড় বা আখড় অর্থাৎ স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা একটি পৃথক বাক্যের ভাব বা ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে বোঝায়। 'কুড়মালি ভাষা-সন্ধান' গ্রন্থের লেখক শ্রী ভগবান দাস মাহাত ও 'কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের লেখক ভরত মাহাতো এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমি এই উভয় লেখকের ভাবনাকেই এখানে গ্রহণ করেছি। বিশেষত শ্রী ভগবান দাস মাহাত-র গ্রন্থ থেকে এই অংশটি সরাসরি গ্রহণ করেছি। একাধিক ভাষায় এরকম ব্যবহার রয়েছে। বাংলায় আমরা বলি— 'তুই যা', 'এই যা, এ আবার কি করলি!' বা ' ও বুঝেছি তোর মতলব।'— এসব বাক্যে যা, এ, ও এক একটি বর্ণে বাক্যের ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। বিশেষত আঞ্চলিক উচ্চারণে এই প্রবণতা আরও বেশি লক্ষ করা যায়। ইংরেজিতে A বা I, O দিয়ে বাক্যের ভাব স্পষ্ট করা যায়। I am a boy, O my God ইত্যাদি। কুড়মালি এরকম এক অক্ষর বিশিষ্ট কুড়মালি শব্দের প্রয়োগ নিচে দেওয়া হল :

অ- (স্বীকারার্থে) অ . . . বুঝলি এধাঁও। অ বুঝলঁ এখন।
(ব্যঙ্গার্থে) অ . . . হামার এথায় থ্যাকতে নাই ভাল ল্যাগছে।
(গানের ১ম কলি ধরার আগে) অ— মরিচ দেখতে সুন্দর .
মুহে খালে চইখ্যে পড়ে লর। (পাঁতানাচের গীত)

ই- (সর্বনাম এ) — ই যাবেক বল্যেছে। ই কাজটা ভাল হইল্য নাই।
— ই হামার মাটি, ই হামার দেশ। পাইরবেক নাই বিহা করত্যে।

ইঃ- (বিস্ময়সূচক)— ইঃ তর সঙ্গেও পিরিত আছে উয়ার।
(ইঘর যায় উঘর যায় দুম কর্যে কাচাড় খায়

ই ঘর যায় উঘর যায় কপাট কুনে কাচাড় খায়। (ধাঁধা)

উ- (সর্বনাম, সে) উ ছানাটাও যাতে খুজছে যে, কি মুসকিল।

—উ-হ খাবেক

—(সেই) উধারে যাইস না, কাঁটা আছে।

—(ঐ) উ বেলার ভাত আছেত ? উবাটে গেলে মরণ আছে।

(উ— (সাঁওতালি) কুরকুট, লাল পিঁপড়ে। উ বিনু বাসকে মাড়ি বাক জমা।)

ক- (কহা, বলা)— তুঁই কহনিটা ক না ? শিক শিক বংশী ক দেখি কেহনিটা।

(কত, কয়েক)— ক'লক বরিয়াত আইসবেক, ক মুঠা চাল মেরাছিস ?

(কম)— ক লক ত আইসছে।

(গাছ)— ক গাছেক তলে বড়া সাপ দলে।

খ- (খাওয়া)— চাঁড়ে খা, রেল গাড়ির বেলা হঁয়ে গেল। খাবি ত খা না হলে ঘুমা। খা-ন কতক খাবে হে, বাঁধিত নি লেগবেহে।

খি- (খেই)— আউল সুতার খি, খুজি পাঁয়েঁছি।

গ- (সম্বোধন)— মার ন গ বইস টুকু।

গা- (শরীর) —উপর গা টা তাতল। হামার গা ছুঁয়ে দেখ, কত গরম। রউদটা তর গা-এ সইবেখ নাই। 'বিষটুপুরের হল্যাদ আন্যে গা ক'রব আল'— টুসু গীত

আইগ লেইকে খেলবে ত গা বাঁচায় চলবে।

(গর্ভ)— বহুটার গায়ে আছে।

ছুয়াটিক গা-এ পানিলাগলা হেক।

গু- (মল) গু হের এ পিঠ উপিঠ, কন পিঠটা ভাল ?

যার পঁদে গু, উ বলে সরিয়াঞ শু। প্রবাদ।

গু-মুতে ডিঙায় আছে ঘরটা।

ছোয়াল্লে ছোয়াক গু ভারি। (প্রবাদ)

গে/গ- (সম্বোধন সূচক)— দে ন গ তামুক টুকু। দেনা গে চেংনাটা ধরা ধর-ন গে পঁঠরুটাকে ? হঁ গে লে ছওয়াটাকে ধরি হেঁ, ভাতটা নাভাহেতেক।

ঘা- ঘা টা দুখাছে। তকে ছুলেই ছ ঘা (বাহানা)।

ঘায়ে মুড় টা ভারি গেলাহে, নাংরায় মালা পিঁধাউ হেতেক।
বাঘে ছুলে আঠারো ঘা।

ঘি- (ঘৃত) ছানাটা ঘি-দুধ খাঁয়্যে বাঢ়্যেছ্যে।
ধইন্যরে মাহাতানেক জীউ, এক সের নুনে দুই সের ঘিউ। প্রবাদ

চ- (চল্)— চ বললেই খাঁধে লাঠি। প্রবাদ।
চ দেখি একবার উয়াদের ঘর যাব।
চচ আর এথায় এক দঁড়ও থ্যাকব নাই।
কেইলেই চলা, আসর বাঁধলেই গলা। (প্রবাদ)

চং- (বাতিক, খেয়াল)— লকটা চং বায়া হেকে।

চা- (চাওয়া)— তুই একবার তর বাপের ঠিনে টাকাটা চা দেখি।
(পানীয়)— চায়ের বাগানে, তকে ঝলকাইল্য মুসলমানে। (গীত)
ভিড়কিস্ কাহে, বশ কেরলউ চা-হে।

ছ- (ছল /ছউ)— ছ দেখাস না, কাজটা কর। তর ছ দেখে ভুলব নাই।
— ছা নাচেক দল আওয়েহেলা।
(সরে দাঁড়া)— ছ হেঁ ইঠিন লে, ছদঁ ছঁদাহিস কিনালায় ?
(সংখ্যাবাচক)— ছ ছানার মা, মা গতে আস্যেছে।
ঘার নাই দুয়াইর নাই, ছ ছোয়াক মাঞ। (প্রবাদ)

ছা- (ছানা)— ছা পুষা মানুষ গিলার হালত খারাপ।
ই ছা-ছানা লিয়ে বিদেশে থাকে।
ছা-এ মায়েঁ তিন লক, তাউ কহহত কতেক লক ?

ছু- (ছোঁয়া /স্পর্শ করা)— বিন সিনানে হামাকে ছু দেখি!
ছু দেখি মকে, তারিয়া গনাওব তকে।

ছি- (ঘৃণাসূচক)— ছি! ই কাজ করিস্ না।
— দেখ সব দুনিয়াক লক, ছি ছি ধরমকরম লেইকে এতেক ঠক ?

জা- —(দেওরানি, জেঠানি, বড়ননদ) হামর জা-এ কুহুভাত রাঁধেই।
একেও ছোয়াক জালা, তাকর উপর জা-কে ভালা!
(ধনুকের ছিলা) : জাটা বাঁশেক পাতিক হেলে বেশ হেই তেলাক।

ঝি- (কন্যা) ধন্যরে বড়লোকের ঝি,

শাগ ছনকাছে দিয়েঁ ঘি।

কঠিন লক আহাত ই হাঁয়ে, ঘার ছাড়াওলেথিক ঝি-এ মায়ে ?

ঠাকুরঝি — (বড়ননদ) ঝি পালাইল ঝিঁ ঝিঁ পকার ডাক শুনে।

ঝি- (পিসি)— চুনু ঝি সাশকে শুসরায়।

টা- (একবচন নির্দেশক)— খাটিটা সরিয়াঞ দেন।

টি- (একবচন নির্দেশক) বঁধুয়াই পানখিলিটি হাথে হাথে দিল।

ডা- বৃহত্তর ছোটনাগপুরেরকৃষি সংস্কৃতিতে প্রত্যেক বছরের জ্যৈষ্ঠমাসের ২১ থেকে ২৭ পর্যন্ত এক সপ্তাহ সময়কে আমডা, মিমডা (আম ডাহা, নিমডাহা) তে বিভক্ত করা হয়। ডাহা (১ ডা) থেকে 'দাহ' শব্দ আসতে পারে। 'ডা' মানে অত্যধিক গরমে পুড়ে যওয়া।

ধরনেক ডা বহেহেক

গায়ে ইটা নি সহেহেক।

ডি- (ডিহি, ডিহা, পাড়া, ছোটগ্রাম)— ডি বা ডিহা বা ডিহি দিয়ে অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায়। গালুড়ি, নিমডি, কড়ডি, চিরুডি, লউতনডি, সাঁওতালডি, মহুলডিহি, পড়াডি, তালডি, আমডিহা, লালডিহা, সরডিহা প্রভৃতি।

ঢি- (ঢি মারা, মাথায় মাথায় আঘাত /ঠক্কর দেওয়া)— ঢি মারিস না মাথায় শিং বাহিরাবেক।

ত- (বিকল্পসূচক, তবে)— আখড়া আছে ত দুঘড়ি নাচনি রাখ।

'জাতরায়ত উড়ালি পটম কাঁহা রাখলি'— গীত

যাছিস ত দিয়েঁ রাখ। ত-অ উখানে যাবি নাকি ?

হঁতঅ দে লাগতেক ত দেবঁ।

মন আছেত ধন নাই, ধন আছে ত মন নাই। (প্রবাদ)

মারিত হাথি লুটি ত ভানডার। (প্রবাদ)

তা- (পাক দেওয়া)— বুঢ়া বরে মচে তা দিছে।

(তাপ)— মুরগিটা ডিমের উপর বস্যে তা দিছে।

বেসি বেসি গেলি বেরা, হরল ডিমে তা মারা। (প্রবাদ)

(তাহা)— তা দেখলে হইথ্য।

তু- (তুঁই)— তু কেনে কাদা দিলি সাদা কাপড়ে। লোকগান।

থ- (থই)— ক মানুষ জল আছে, থ মাঁরে দেখ না ?

থা- (থই)— ডুবলে ন থা পাউবে ?

(আশ্চর্য হওয়া)— কথাটা শুনে উ থ মার‍্যে গেল।

থ- (কারণ, সন্ধান, খেই)— লকটা কি কর‍্যে মরল্য, থ পাওয়া গেল না।

দ- (দহ, হ্রদ) (গভীর জলের স্থান)— লদির বাঁকে বাঁকে দ থাকে।

দু- (সংখ্যাবাচক, দুই)— ধইন্য রে মাহাতানেক জীউ

একসের নুনে দুসের ঘীউ।

কন বিহাকে দুঘইড়ে আলতা। (প্রবাদ)

দু- (দুহা)— গাইটাকে দু।

দা- (কাস্তে)— দা দিয়েঁ ঘাঁস কাটা হয়।

দা-এর পুড়িগিলা খিয়াঞ গেছে।

দি- (দেওয়া) ডাঁঢ়া, উয়াকে খাজাড়ি খাতে দি আগু।

দে- (দেওয়া)— দে পইসা বুগলি খসা। লোকভাষা।

ভিখারিটাকে দে একমুঠা চাল।

আল্লা মেঘ দে পানি দে। গান।

দুকনা চাল মেরাঞ দে।

দিদি দে রঙ বেঁটে,

হামি হাব সিনতে লদির ঘাটে। টুসুগীত।

(দা- (সাঁওতালি) জল— দে হিলি দাঃ মাড়ি, এডি রেঙ্গে ইংকানা ঝাইলদা > ঝালিদা : ঝাইল অর্থাৎ দূরে বা গভীরে। দা= জল। অর্থাৎ যেখানে জল গভীরে পাওয়া যায়।)

ধ- (বৃক্ষ বিশেষ)— ধ কাঠ শক্ত বলে গরুর গাড়ির লিঘা তৈরি হয়।

(লিঘা excel, অক্ষদণ্ড)

ধ-বনি, ধ-ডাঙ্গা, ধ-ডিহা প্রভৃতি গাঁয়ের নাম পাওয়া যায়।

ধু- (ধোওয়া)— লুগাটা কচ্‌টাঞ (কচলাঞ) ধু।

ন- (না /বিকল্প)— ভাত দিবি ন নাই দিবি। উয়াকে গড় করব্য না চুমাব।

'চিনহায় দে ন গ দিদি কে বঠে লকটা'

ন- (সংখ্যা)— ন মন তেল পুড়বেক ন (তবে) রাধা লাইচবেক ?

ন দিনে নরতা।

নি- (নাই)— অঞ নি খাতাক। (কুড়মালি)
মুই যামু নি। (ওড়িয়া)

নু- (নুয়াপড়ে)— টুকু নি, পিঠকামড়ি হব।
(থেকে চেয়ে)- বাঁশের নু কনচি দঢ়। (প্রবাদ) ওড়িয়া

পি- (পিনা, পান করা)— পানি পি লে।

পা- (পাওয়া)— ই মাস খেজাটা তুই পা আগু, তারপরে কথা।
আগু লটারি টা পা, তারপরে অন্যকথা।

ফি- (প্রতি/প্রত্যেক)— হাঁসটা ফি মাসেই ডিম পাড়ে। ফি লকে একটা করে বই পাইল্য।

ব- (সম্বোধনসূচক)— কি ব ভাগনা, ভাল আচ ?

ভঁ- (ধ্বন্যাত্মক)— ভঁ করে উড়াকলটা উড়্যে গেল।

ভূ- (সমস্ত)— ভূ-ভারতে তর কি কেউ নাই ?

ভি- (ও)— সে ভি কটক জিব (ওড়িয়া)। ম্যায় ভি জাউঙ্গা। (হিন্দি)

ভা- (খাড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত)— উটা ভা ভাল কথা বঠে।

ম- মুঁ জেবি ম (ওড়িয়া)। (আমি যাব তো।)

মা- (মাতা)— যার আছে দু মা, তা কিসের কমা। (প্রবাদ)

মু- (মুখ)— মাগরে মু খাবি ত ?
উপর বাটে মু করে, শিয়াল হুয়া হুককা করে।
পান খাওয়া মু দাঁতে চিনহায়। (প্রবাদ)

য- (যত)— য বার মারে, ত বার কাঁদে।

যা- (যাওয়া)— তরা খা যা, হামি খাব নাই।

যা- (যেটা)— তরা যা পারবি কর।

র- (রহা, থাকা, থামা, দাঁড়া)— আইজ র ন কাইল যাবি।
— র র তকে দেখছে এখন।
— টুকু র হামি আসছি।
(দুধহীন)— র-চা কর, আদা দিয়ে।

রা- (সাড়া, শব্দ)— রা-এর উপর রা পড়ল্য,

ঘরে দেখ কুটুম আইল্য। (প্রবাদ)

—মকর পরবে, তরা রা কাঢ়িস নাই গরবে। (টুসুগীত)

রু- (হতে, থেকে)— কাঁহিরু আইলু (ওড়িয়া)

রাঁচিরু কইলকাতা ৫০০ কিমি ধুর। (ওড়িয়া)

লে- (নেওয়া)— লে লিবিত ঝালবড়া। লেন ধর বঝাটা।

ও খাল ভরা রে লাইচব ত ছেলা কলে লে। (ঝুমুর)

(চেয়ে)— বাঁশের লে কনচি দঢ়। (প্রবাদ)

মায়ের লে মাউসির দরদ বেশি। (প্রবাদ)

মাগার লে হিন নাই, দিয়ার লে পুইন্য নাই। প্র।

লি- (নেওয়া)— হামার ভাগটা হামি ল তবে।

শু- (শুয়েপড়া)— যার পঁদে গু, সে বলে সরিয়াঞ শু। (প্রবাদ)

মাছ্ ধরলেথিন গটা পাড়া, শুতি রহ্‌লাক খালভরা।

স- (সহ্য করা)— কাঁদছিস কেনে টুকু ত স।

(চিতা)— 'স' টা ভাল করে বানা (বনা)।

হ- (থামা)— (গৃহপালিত গরু-মোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)— 'হ' বললে

গো-মহিষ দাঁড়িয়ে পড়ে।

হিঁ- গো-মহিষ তাড়ানোর অসুজ্ঞা বাচক শব্দ।

হঁ- (সম্মতিসূচক শব্দ, হ্যাঁ)— হঁ হামি যাব নাই ত কি করব্য।

হাঁ- (হাঁকরা, হা-ফাড়া)— হা ফাড়া, গলায় মাছকাঁটা লটকিল নাকি, দেখি।

তকে ছাড়ি ওকে দেলে,

তা দেখি তঁই হা ফাড়লে।

হাঁ- (লোভ) — উয়ার অনেক বড় হাঁ।

হেঁ- অন্যের ডাকের সম্মতিসূচক শব্দ।

ণ. এক কথায় প্রকাশ (বাক্য সংকোচন)

অনাবৃত করা : উঘ্‌রা।

অন্যের গায়ের উপর শরীরের ভার রাখা : লদকা, লেদকা।

অস্থির ভাব : অহল-বিকল, অকবকা, অকল-বিকল।

অল্প কথা বলে যে : মুহচরা, মুখচরা।

অন্ধের মতো ঠোক্কর খাওয়া/চলা : আঁধড়া।

অন্য জনকে গরু/কাড়া চাষ করতে দেওয়ার চুক্তি : বাঁহিচা, বাঁহচা।

আন বাটে মন যায় : আনমনা।

আপনার রূপ লুকায় যে : রূপচরা।

আগুনে ফুঁ দিবার নল (লোহা বা বাঁশের) : ফুঁকনল।

একটু একটু ঠেলে সরানো : চঁহরা, সঁসরা।

একত্রিত করা বা জড়ো করা : ডিঁগা।

এঁড়ি তুলে দাঁড়ানো : টিঁড়গা।

কনুই দিয়ে আঘাত করা : টেহনা।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী : বোয়াসিন।

কালো বিষ পিঁপড়ে : জয়াঁ (জঞা)।

কান পেতে শোনা (চুপিচুপি) : অনা।

কিছু গলায় আটকে যাওয়া : হিল্‌গা।

গরুবাছুরের ঘরের বাইরে মাঠে বিশ্রামের স্থান : বাথান।

গিলে ফেলা জিনিস আবার মুখ দিয়ে বের করা : উল্‌গা/উগ্‌লা/উগ্‌রা।

গরু বা মোষের গলার কাষ্ঠ ঘণ্টা : ঠড়কা/ঠারকা।

গুড় রাখবার মাটির পাত্র : গুড়কুম।

গৃহের পিছনের দিক : পিদাঁড়/বাড়ি।

ছ-মাস অন্তর : ছ-মাসিক।

ছোট শিশুর নিজে থেকে উঠে দুপায়ে দঁড়ানোর অবস্থা : অলগডিডি, ঠঁড়ুয়া।

ছোট কলসী : ঠিলি, ঠিলিয়া।

ছোট শিশুদের দুধ খাওয়ানোর পিতলের তৈরি পাত্র (প্রদীপাকৃতি) : গঁধল/গঁদল।

জানবার ইচ্ছা : পুছতাছ।

জমিতে প্রথমবার হল কর্ষণ করা : উগাল।

জমিতে দ্বিতীয়বার কর্ষণ করা : সামাল, সাম্‌হাল।

পানের ইচ্ছা : পিয়াস।

ভিক্ষার অভাব : আকাল।

যার স্বামী মারা গেছে : রাঁড়ি।

যে জমিতে দু-বার ফসল হয় : দুফস্‌লা।

যা সহজে ভেঙে যায় : ঠস্‌রা, ঠসা।

যা দুলে চলছে : দুলকি।

মজুরির পাওনা : বেরহন।

যে গাছে /লতায় ফল ধরে না : সাঁঢ়া

বিড়ালের ডাক : মিউ।

ভাবা যার স্বভাব : ভাবুক।

যার কোনখানেই ভয় নেই : নিডরুয়া।

পরপর জাত সহোদর ভাইবোন : পিঠাপিঠি।

বারো মাসের কাহিনি : বারমাসিয়া।

প্রাতঃকালীন ভোজন : বাসিয়াম, বেসিয়াম।

শুভক্ষণে জন্ম যার : খেন্‌জন্‌মা।

গ্রীষ্মকালে যখন জমিতে ফসল থাকে না : নিরন

যে অগ্রে গমন করে আহ্বান করে : আগুয়াহি।

ভাদ্রমাসে জাত : ভাদ্‌রিয়া।

বর্ষা মাসে জাত / উৎপন্ন : বেরসাতি।

বেশি কথা বলে যে : বাচাল।

সন্তান হয় না যে নারীর : বাঁঝি।

যার ছন্দ নেই : বেছন্‌দ।

বাসগৃহের পিছন দিক : পিদাঁড়।

মোরগ লড়াইয়ে পরাজিত মোরগ : পাহুড়।

যার ঢঙ নেই : বেঢঙিয়া।

ঠান্ডায় লোম খাড়া হওয়া বা শিউরে উঠা : ঠিটরা।

যে ভয় পায় : ডরকু।

অবিবাহিত থাকা : ডাঙুয়া।

যৌবন প্রাপ্ত : ডাগর।

গাছের ডালে থাকে (বাস করে) তে : ডালুয়া /ডাইরধরা।

তামসা করে যে : ডিঙর
যে নারী সহ্য করতে পারে না : অসহনি।
ব্যস্ততার অভাব : অব্‌সর।
ঝুলে থাকা : অল্‌মা, ঝঁকরা।
বিছানায় গা ছড়িয়ে আরাম করা : অলঢা।
শুরু করা : উচ্‌রা।
সংরক্ষণ বা দেখভাল করা : আগলা।
শরীর এলিয়ে পড়া : আউলা।
দু-হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরা: আঁকড়া।
সাপের খোলস : আঁচুর।
ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে কান্না : আঁড়রা।
পুরনো কাপড় প্রায় ছিঁড়বার উপক্রম : আধড়।
নাকি সুরে কথা বলে যে : খেনা, গেঁগনা।
পন্য দ্রব্যের প্রথম বিক্রয় : বহনি।
বাছাবাছির পর যা অবশিষ্ট থাকে : বাছইট/বাছট।
বিছানায় পাশ ফেরা : করট।
প্ররোচিত করা : টিরকা, পুলকা, ঠিরকা।
বিয়ের পর বর ও কনেকে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান : বাঁদাপন।
সময় এগিয়ে আসা : লইজকা, নেইজকা।
যার লাজ নাই : লিলজ, নিলজ।
মুঠো ভর্তি ধান ছড়িয়ে ধান বপনের শুভারম্ভ অনুষ্ঠান : মুইঠ।
মেমে শব্দে ছাগলের চিৎকার : মেমা।
ভুট্টার ভাজা আফোটা বীজ : ভুটু।
শিশুর প্রথম অন্ন গ্রহণ অনুষ্ঠান : ভুজনা।
যার ঘর নেই : অঘরি, অঘউরি, বেঘরুআ।
যে নিয়ে আসে : আন্‌তাহার।
বঁড়শিতে মাছ ধরার সময় মাছের খাবার : আধার।
সোজা রাস্তা ধরে চলা : উজান. উজাঁই।

লাউ খোল থেকে তৈর পরিবেশন হাতা বা চাটু : ডাঁটি।
যার কাজ নেই : নিকামিয়া।
বিধবা/বিবাহ বিচ্ছিন্নার দ্বিতীয় বিবাহ : সাঁগা, সাঁঘা।
চোখের বা পেটের জলে ভরা অবস্থা : ডব্‌ডব্।
দাঁত দিয়ে কামড়ানো : চাভা।
শুনেও যে না শোনার ভান করে : নেকা, লেকা।
মাটি বা পাথরের পাত্রে শীতের দিনে ভুষি বা কুচোকাঠ দিয়ে আগুন রাখার পাত্র বিশেষ : ভুরসি।
প্রবল আনন্দে ছুটোছুটি করা : মল্‌কা।
হাতের তালুতে পেষাই করা : মস্‌কা।
মেয়ের মতো স্বাভাব যুক্ত পুরুষ : মাইচা।
ছাগল বা ভেড়ার নাদ (লাদ) : লেদাড়ি/নেদাড়ি।
বাম হাত চলে যার : নেগড়া।
লাথি মারা : গঁড়রা।
বিরক্তি ভাবে নিজমনে বকবক করা : গঁদরা।
উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করা : গগা।
বাঁশের কঞ্চি বা সরুডাল দিয়ে তৈরি কপাট : টাটি।
চাষির বাড়িতে বার্ষিক ভিত্তিতে সর্বক্ষণের জন্য কাজ করে যে : ভাতুয়া।
পাছা ঘসটে সরে যাওয়া : চঁটরা।
ভারি বস্তুকে মাটির উপর দিয়ে একটু একটু ঠেলে সরানো : চঁহরা।

ত. কুড়মালি ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার তুলনা

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ছোটনাগপুর পার্বত্য অরণ্যভুমির ভাষা মূলত তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা দাবি করেছেন। এগুলি হল প্রোটোঅস্ট্রালয়েড বা প্রাকদ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও নাগভাষা। প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে মুণ্ডারী, সাঁওতালি, হো, খাড়িয়া, ভূমিজ, বীরহড়, তুরি ও অসুরী ভাষা। আর দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হল কুড়ুখ (ওরাঁও), মালতো, কিসান, বর্গা, ধাঁওড়ি, মালপাহাড়ি, খেঁন্দরই। আর নাগভাষার মধ্যে পড়ে নাগপুরি, কুড়মালি, খোরটা,

পাঁচপরগনিয়া, তামাড়িয়া, গোলওয়ারি, সুরগুজা, ডোমালি, গনওয়ারি প্রভৃতি। এই অঞ্চলের আর একটি ভাষা হল সাদরি ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীরা অ-আদিবাসীদের সাদান বলত। সাদানিদের মাতৃভাষাকে বলে সাদান বা সাদরি। একে নাগপুরিয়াও বলে। কিন্তু নাগবংশীয়দের প্রভাবে ঝাড়খণ্ড এলাকা এখন নাগদেশ Nag Country বা Nagdeshi বা নাগপুর নামে পরিচিত। এই নাগপুরের ভাষা নাগপুরিয়া। আর সাদরি শব্দটি এসেছে সদর থেকে। সদরের ভাষাই Official Language সাদরি ভাষা।

আগেই বলেছি কুড়মিরা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়েরই স্বগোত্র। তাই ভাষাগত ভাবেও এদের মধ্যে সমীপ্য লক্ষ করা যায়।

এখানে আমি প্রথমে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে কুড়ুখ (ওরাঁও), সাঁওতালি ও মৈথিলী শব্দকোষের মিল বা নৈকট্য দেখাচ্ছি। তারপর বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া, সাঁওতালি ও ইংরেজিতে তার রূপটির উল্লেখ করছি।

কুড়মালি ও কুড়ুখ শব্দের সাদৃশ্য

কুড়মালি	কুড়ুখ	কুড়মালি	কুড়ুখ
উরমাল	অরুমাল	গতিয়া	গোতিয়া (গোত্র)
আঁড়ু	আঁড়কু (অণ্ডকোষ)	চিমশা	চিমশা (চিমশে)
আজড়া	আজড়া (খালি করা)	চকলি	ছিলকা
আগালি	আগালি (অগ্রভাগ)	ছিতরা	ছিতরা
আঁঠু	আঠু (আঁটি)	জুঁঠা	জুট্‌ঠা (এঁটো)
আবড়-ঝাবড়	আবাড় ঝাবাড় (এলোমেলো)	জিরা	জিরান (বিশ্রাম)
		ঝগড়াহি	ঝাগড়াহি (ঝগড়াটে)
উড়িশ	উড়েহিস (ছারপোকা)	টেঢ়া	ট্যাঢ়হা (বাঁকা)
উব্‌জা উপ্‌জা	উপজা (উৎপন্ন করা)	ঠিপি	ঠিপি (ছিপি)
		ঠেকা	ঠ্যাকা (ঠেকনা)
উবুড়	উবুন	ডগ্‌	ডোগ (ডগা)

সিনান	এসনা (স্নান)	ডেঢ়্যা	ডেড়হিয়া (দেড়গুণ)
উড়না	ওড়না		
অড়	ওড় (শেষপ্রান্ত)	ডাবনা	ডাবনা (ঢাকনি)
অস্তাদ	ওস্তাদ (গুরু)	টুঁড়া	টুঁড়া (খোঁজা)
কুঁয়া	কুয়া	ঢের	ঢেড় (বেশি)
কঠিন	কাঠিন	ঢেলকা	ঢেকা (ঢিল)
কিরাসিন	করিসান	তিরছা	তিরছা (তেরছা)
কুঢ়িহা	কুড়হিয়া (কুঁড়ে)	তত্‌লা	তোত্‌লা
খেহাইড়	খহাড়	তাগড়া	তাগড়া (হৃষ্টপুষ্ট)
গঙা	গোঙা (বোবা)	বুঁজা	বুঞ্জা (বন্ধ করা)
তিতা	তিতা (তিক্ত)	বেরাম	ব্যারাম (অসুখ)
থথ্‌না	থোতনা / থুতনি (চিবুক)	ভঁথড়া	ভোঁতড়া (ভোঁতা)
থাহ	থাহা (নাগালে)	ভুজা / ভুজিয়া	ভুঁজা (মুড়ি)
থেবড়া	থ্যাবড়া (থেবড়া)	মট্‌কা	মটকা (মোটা)
থাপড়ি	থাপড়ি (তালি)	মেলা	ম্যালা (অনেক)
দহি	দ্যাহি (দই)	মকাই	মাকাই (ভুট্টা)
দড়অ	দড়হো (শক্ত)	মশারি	মুশারি
দুপার	দুপ্পহর (দ্বিপ্রহর)	মজা	মোজা
দবড়া	দাহড়া (ভাঁজকরা)	মিশরি	মিশরি (মিছিরি)
দেদার	দেদার (অধিক পরিমাণ)	মহ্‌লম	মহলোম
		রূপা	রোপা (রোপণ)
ধমকানি	ধমকানি	রদ্দি	রদ্দি (বাজে, নিকৃষ্ট)
ধাত	ধাত (বীর্য)		
থিরে	ধীরে (আস্তে)	রাহড়	লাহারি (অহর)
লেংটা	নাঙটা	লেস্‌ড়া	লেসড়া (নড়বড়ে)
নিদঁ	নিন্দ	সাবু	সাবু (সাশু)
নুনছ্যা	নুনছা (নোনতা)	সাবন	সাবুন

প্যাঁড়কা/ পাঁইড়কা	পাড়কি (ঘুঘু)	সবুর	সোবুর (অপেক্ষা, ধৈর্য)
পুসা	পুসা	হাউলাৎ	হাউলাৎ (ধার)
ফেসাদ	ফ্যাসাদ (বিবাদ)	হুড়মুড়	হড়মড় (জলদি, তোলপাড়)
ফেঁকড়	ফ্যাকড়া (বিবাদ)		
ফগলঅ	ফোগলা (ফোকলা)		

কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দ নৈকট্য

কুড়মালি	সাঁওতালি	কুড়মালি	সাঁওতালি
উমেইর	উমের	কাঁইচি	কাপ্‌চি
ফারাক	ফারাক	হার (লাঙল)	মাহেল
হাপ্তা	হাপ্তা		
উরমাল	উরমাল	ডাইর	ডার
কাতলা	কাতলা	হাঁড়ি	হাড়ি
বাগডুলু	বাগডুলু	বাপ	আপা
পুসি	পুসি	কাড়া	কাড়া
গুড়	গুড়	গেরুয়া	গেরু
চাখা	চাখা	বহু (বৌ)	বাহু
পাগরা	পাগরা	বেউনি	বিনি
ঠিলিআ	ঠিলিআ	পাঁচির	পাচারি
কদইল	কদল	সগড়	সাগাড়
ঘাঁগরা	ঘাঁগরা	ঢেঁকি	ঢিংকি
কাব্‌রা	কাব্‌রা	বুকু	বুকা
দাদা	দাদা	রাহেড়	রাহেড়
ডাঁগওয়া	ডাঁগওয়া	তুলা	তুলাস
ডাংরা	ডাংরা	ডিংলা	কুমড়া
কাবু	কাবু	কঁঠর	কান্ঠাড়
গদাম	গদাম	মরিচ	মারিচ

অক্কেল	আকিল	সারত (কচু)	সারু
মশাল	মারশাল	ছাতা	ছাতার
নারকল	নারকড়	মাগুর	মাঙ্গারি
কাতু (রামদা)	কাতো	দহি	দাহে
হঁসুআ	হাসুআ	দাইল	দাল
বালটি	বাল্‌টিন	শকর কাঁদা	সেকের কেঁদা
পতরি	পাতড়া	ডহর	ডাহার
শাঁখা	শাংখা	সগুন (শুভ)	সাগুন
কাজর	কাজার	বইরি (শত্রু)	বাইরি
গেড়ে	গেড়ে	ধুঁয়া	দুহাঁ
দুঁদু (পেঁচা)	দঁদু	জনম	জানাম
(হুতুম পেঁচা)		হাট	হাটিয়া
গুঁড়ুর	গুঁড়রি	মড়ি (শব)	মাড়ি
ঢেবচু/ফিঙে	ঢিপচু		

সাঁওতালি ভাষাতে বিরাট শব্দভাণ্ডার রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানে নিয়মানুযায়ী অনেক সাঁওতালি শব্দ যেমন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় (বাংলা, ওড়িয়া, নাগপুরিয়া, কুড়মালি, কুড়ুখ প্রভৃতি) প্রবেশ করেছে, তেমনি বহু শব্দ অন্যান্য ভাষা থেকেও সাঁওতালি ভাষা গ্রহণ করেছে। যে ভাষা যত বেশি উন্নত, তার শোষণ ক্ষমতা তত বেশি।

কুড়মালি ও মৈথিলী ভাষার শব্দের মিল লক্ষণীয়। পাশে বাংলা প্রতিশব্দও দিলাম।

কুড়মালি	**মৈথিলী**	**বাংলা**
ইঁজরিয়া	ইজোরিয়া	জ্যোৎস্না
উবাটে	উনহার	ঐদিকে
একর	একর	এর
এইসন	ঐসন	ওইরকম
এলাহি	এলাহি	প্রচুর

আইড়	আল্	সীমানা/আইন
উধার	উধার	ঋণ
অকর	ওকর	ওর
কাপাস	কাপাস	কার্পাস
আউলাদ	ঔলাদ	সন্তান
খার	খার	সোডা
গোমড়া	গোমরা	ভারিক্কি
চালাক	চাল্হাক	চালাক
ছাত	ছৎ	ছাদ
জুঁঠা	জুট্ঠ	এঁটো
ঝট্‌করি	ঝটকরিক	তাড়াতাড়ি
ডর	ডর	ভয়
নেওতা	নেওত	নিমন্ত্রণ
থকল	থক্‌ল	শ্রান্ত
দরদ	দরদ	ব্যথা
ধরম	ধরম	ধর্ম
বরদ	বরদ (বইল)	বলদ
রফা	রফা	বায়না
সাঁপ (লতা)	লত্তর	সাপ
সঁকড়ি/সঁকড়ি	সঁকড়ি	এঁটো
হারল	হর্‌ল	পরাজিত
গড়বড়	গরবর	বানচাল
ঠাহর	ঠাউর	মনে করা
ডাইর	ডাল	শাখা
ঢাঙ্গা	ঢেঙ্গা	লম্বা
নুনু	নুনু	শিশু
ফারাক	তফাৎ	ফারাক
সুপ	সুপ	কুলা

দুয়াইর	দুয়ার	দরজা
তাক	থাক	স্তর
তুরুৎ	তুরুৎ	তাড়াতাড়ি
ফুরতি	ফুর্তি	ফুরতি
লর	লোড়	চোখের জল
সঁইনঝা	সঞ্ঝা	সন্ধ্যা
অ্যাঁগলা	অইগ্না	উঠান
কেরিআ	করিয়া	কাল
ছাল	ছাল	বাকল
জাং	জাং	জানু
ঠন্‌ক	ঠুন্‌ক	ভঙ্গুর
থারি	থারি	থালা
দালান	দালান	পাকাঘর
পরব	পরব	পার্বণ
পরস	পরস	পরিবেশন
বিমনি (বেউনি)	বিমনি (বীন)	পাখা
লুগা	ঢেইর	অনেক
হামর	হামর	আমরা
নিদ	নিদ	নিদ্রা
ফেঁকল	ফেক্‌ল	ফেলা

এবার কুড়মালি, বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, সাঁওতালি, ইংরেজি ভাষায় একই বাক্যের রূপ তুলে ধরছি।

কুড়মালি ভাষা : ''তকে মঁই এতনা করিকে মানা করলঁ যে তঁই কাকরঅ্ কথাএঁ কান দেসিক না। তঁই সুনলে'নি। এখন দে'খেঁ কেতনা ঝামেলা হেলেক! ইবার তকে কনে বাঁচাও তও ? এখন হামরা কেই সভেকে মিলিকে বাঁচাও এ হেতি। উ'খনে সুনলে আর এহে ঝামেলাটা নি হেই তেলেকে। ঠিক্ আহেক্, তর হতাস হেউ' এক কন্'অ নে'খও। তঁই খালি চুপ্-চাপ্ রহ'বে।''

১) বাংলা ভাষা : ''তোমাকে আমি এত করে বারণ করলাম যে তুমি যার তার কথায়

কান দেবে না। তুমি শুনলে না। এখন দেখ তো, কিরকম (কতটা) ঝামেলা হল। এই বার তোমাকে কে বাঁচাবে ? এখন আমাদের সকলকে মিলেই বাঁচাতে হবে। তখন শুনলে আর এই ঝামেলাটা হত না ঠিক আছে, তোমার হতাশ হবার কোনো প্রয়োজন নাই। তুমি শুধু চুপচাপ থাকবে।''

২) হিন্দিভাষা : ''তুমকো হম্ কি'তনে বার বোলা, মানা কিয়া। সমঝা নেহিঁ, কি'সিকা বাত পর কান মত লাগানা। তুম শুনা নেহি। অব্ দেখোতো কৈসা ঝামেলা হুআ! অব্, তুমকো কোন্ বঁচাএগা ? অব্ হাম্ হি সবকো মিলকে তুমকো বাঁচানা পড়েগা। অগর শুনতা তো ই ঝামেলা নেহি হোতা। ঠিক হায়। তুমকো ঘবড়ানেকা জরুরত নেহিঁ। তুম একদম চুপচাপ রহনা।''

৩) ওড়িয়া ভাষা : ''তুমকু মুঁ কেতেথর মানা করি থীলি, অন্য লোকংক কথা'রে কান না দেবা পাইঁ। তুমে কিন্তু শুনিল নাহিঁ। এবে তাহালে কেমিতিকা সমস্যা উপুজীলা। এবে তুমকু কিয়ে বঁচাইব। বর্তমান আমে সমস্তে মিলি বঁচাইবা পাঁই পড়িব। সেতে-বেলে যদি আম কথা শুনিথান্ত, তাহলে বর্তমান এই সমস্যা আসন্তা নাহিঁ। ঠিক আছি, তুমর ভংগি পড়িবা দরকার নাহীঁ। তুমে মুহঁ বংদ করি রখীব।''

৪) সাঁওতালি ভাষা : ''ইঞ তিনী ঃ কাতেঞ মেতাঃ মেয়া মানা কেৎ মেয়াঞ যাঁহায় তাঁহায়া কাথারে আলম লুতুরা আঃ, বাম আঁজম লেদা। মাসেঞেল মেচেৎ লেকা ঝমেলা হোয় এনা। নিতংদ তকয়ে বাঞাঃমেয়া ? নাহাঃ সানাম কঃ আতে বাঞ্চাঃ হোয়োঃ আঃ। উন অক্তম আঁজম লেখান নং কান ঝামেলা বাং হোয় কঃ আঃ। যাঁহা আকান গে আলম ভীবিতঃ আঃ ভীবিত্ রেনং লেগ বানুঃ আঃ। আম শুধু থির থার তাহেন মে।''

৫) ইংরেজি ভাষা : ''I had told you so many times, not to listen any one. But you did not hear me. Now see, you are in trouble. Who will save you from this trouble? Now, we all have to do some thing to save you. If you hear me that time, then it would not have been such a problem. But it's ok. You do not have to be disappointed, just be quiet.''

আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেব মানভূম জেলার কুড়মালি থর বলে যে ভাষা নিদর্শনটির উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী ও

সাদানী বা ছোটনাগপুরিয়া ভাষার রূপগুলি উদ্ধৃত করলাম। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' গ্রন্থে ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

কুড়মালি থর: এক লকের দুটা বেটা ছালিয়া রেহেক। তাহাদের মইধে ছুটু বেটাটায় অকর্ বাপকে কেহলাক্ যে বাপ্ হে হামরাকর দৌলতকর যে মঁয় হিঁসা পায়ম্ সে মকে দে।

১) মানভূম : ''এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, বাপ হে, তোমার দৌলতের যা হিস্সা আমি পাবো তা আমাকে দাও। তাতে তাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা করে দিলেক।''

২) মৈথিলী : (১কোটি লোক সংখ্যা) ''কোনো মনুখ্যকেঁ দুই বেটা র'হৈ-নহি। ওহি-সঁ-ছোটকা বাপ সঁ-কহল-কৈ-ন্হি জে, ঔ বাবা, ধনসম্পত্তি মেঁ-সঁ জে হমর হিস্সা হোয়, সে হমরা দিয়হ্। তখন ও হুনকা অপন সম্পত্তি বাঁটি দেল-থী-ন্হি।''

৩) মগহী : (৬৫ লাখ লোক সংখ্যা) ''এক আদমী-কে দু-গো বেটা হলথীন্। উন্কন্হী-মেঁ-সে ছোটকা আপন বাপ-সে কহলক্ কে, এ বাবুজী। তোহর চীজ-বতুস-মেঁ-সে জে হমর বখরা হো-হৈ, সে হমরা দে দও। তব উ অপন সব চীজ-বতুস্ উন্কন্হী দুনোঁ-মেঁ-বাঁট-দোলক্।''

৪) ভোজপুরী : (২ কোটি ৫লাখ জনসংখ্যা) ''এক আদমী-কা দু-বেটা রহে। ছোটকা অপনা বাপ-সে কহলস্ কী, এ বাবুজী, ধন-মে জে-হমার হিস্সা হো-খে, সে বাঁট দী। তব উ আপন ধন দুনো-কে বাঁট দেলস্।''

৫) সাদানী বা ছোটনাগপুরিয়া : ''কোনো আদমীকের দু-ঝন বেটা রহেঁ। উ মন-মধে ছোটকা বাপ্কে কহলক্ এ বাপ! খুর্জী মধে জে হমর বাট্রারা হৈ, সে হমকে দে। তর উ উ-মন-কে আপন খুর্জী বাঁইট দেলক্।''

কুড়মালি শব্দকোষ

অ

অনা : এক

অনা : কান পেতে শোনা

অদা : ভেজা

অধন : রান্নার জশ্য চাপানো জল

অনপড় : নিক্ষের

অখাড়ে : অকারণে/বেঘোরে

অঘন : অগ্রহায়ণ

অবনা-গবনা: আনাগোনা

অওনা-গওনে : আনাগোনায়

অলড়া : বিছানায় গা ছড়িয়ে আরাম করা

অধরাতি :

অগ্যম : অগম্য

আ

আইস: এসো

আওলা : এলো

আড়ে-থাড়ে: অজায়গায়

আউড়ি : খড়

আঘুএঁ : সামনে

আগুহিআঁ : মুখোমুখি হয়ে

আধ : অর্ধেক

আখাইন : আখ্যান

আগড়া : ধানের আগড়া

আড়সি : আয়না

আগুহাহি : আগে এসে আহার করা

আউলাদ :

আলঅ : আলো

আড়াই :

আঘুই : এগিয়ে

আমঠা : অগ্নাশয়

আধুয়াল :

আচকা : হঠাৎ

আশু : আউশধান

আঁগা: জানা

আইড় : আইল

আড়বেলায় : অপরাহ্নে

আজতড়িক : আজ পর্যন্ত

আল্যয় : আসা

আমানি : পান্তাভাতের ফেন

আফুয়া : অতি প্রত্যুষ

আরা : অনূঢ়া

আঁক : বাঁশের আগড়

আঁঢ়্যা : এঁড়ে বাছুর

আঁক্যড় : আঁকড়ে, জড়িয়ে ধরে

আঁখ : চোখ

আঁকুড় : অঙ্কুর

আঁত : পঁটা

আঁধড়া : অন্ধের মতো ঠোক্কর খাওয়া

আধুয়ালি :

আংড়ি : সাত

আনখা : আনাড়ি

আগা : আগের দিক

আখড়ায় : গরুর ক্ষুরে মাটি খুঁড়ে বীরত্বপ্রকাশ

আনখিনে : অন্যজায়গায়

আনথিনে: আনাড়ি, বেতালে

আউল্যা /আউলা : খোলা, খোলা চুল

আশু : আউশ ধান

আঁড়রা : ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে যে

আঁইখেক : চোখের

আঁগুল : আঙুল

আঁবাবতী : অম্বুবাচী

ই

ইসতিআ /ইজর :

ইজতিয়া : জ্যোৎস্না

ইঁদির চিঁদির : অগোছালো

ইঁড়কিছ্যে / ইঁড়কে ইঁড়কে : ছিঁড়ে ছিঁড়ে

উ

উ : ও

উঘরা: অনাবৃত করা

উদমা : অনাবৃত, বন্ধনহীন

উজা : সোজা

উধার : ঋণ

উরমাল : রুমাল

উকাল : সেকাল

উড়িস : ছারপোকা

উপরিআ : অতিরিক্ত পাওনা

উপরা : বাড়তি, উপরি পাওনা

উস্যুল পুস্যুল : পাওনা, পুষিয়ে নেওয়া

ইলহায় : উনানে পাত্র নিয়ে নাড়াচড়া করা

উগাল সামাল : জমি কর্ষণের ধাপ

উদুকখুল্যা : নিঃস্ব, কাঙাল, ভাগ্যহীন

উজড়্যা : উজাড় করে ফেলে যে

উঁট : উট

উগ্‌লা, উল্‌গা, উগরা : বমি করা

এ

এতনা রিকে : এত করে
একঠিনে : এক জায়গায়
এঁড়ি : গোড়ালি
এঁড়িয়া : এঁড়ে
এঁঠুয়া : এঁটো খাবার
এঁড়রাঞ : আড় চোখে তাকানো

ক

করম পূজা , করম পরব, করম ডালা : কুড়মালিদের প্রধান উৎসব
করট : বিছানায় পাশ ফেরা
কড়, কড় আখর :বর্ণ
কচড়া কুড়হাল : কচড়া কুড়ানো, মহুয়ার ফুল ও ফল
কনে : কেমন করে
করিকে : করে
কস্‌টা, কসটিআ : কযাটে
কছুআ : কচ্ছপ
কটা : ধান কিনে চাল বিক্রি করা
কাউয়া, কাওয়া : কাক
কালি : কাল
কাজর : কাজল
কাপাস : কার্পাস
কাকরঅ : কারুর
কাহেরি, কাহেরে : করা
কান্দু : বাঁধ
কঁকা : বোকা
কাঁড় : তির
কাঁড় বাঁশ : ধনুক
কুটলি : কোকিল
কুটা : খড়
ক্যাৎকার : লড়ইয়ে মোরগের পায়ে বাঁধাছুরি
কারসিন : কেরোসিন
কাচ্ছেরলে : কাছ থেকে
কাছ্যাড় : আছাড়
কাছড়া মাড়া : লড়াই, আছড়া-আছড়ি
কঁকাছানা : মায়েরও দুধ পায় না যে
কুলহি : পাড়া বা সরু গ্রাম্য রাস্তা
কুলহিমুড়া : গ্রামের রাস্তার মোড়
কুরম, কুরুম:
কুড়িয়া : কুঁড়ে
কুঁই : কূপ
কুঁচড়ি : কুটজ
কুঁদা : কুঁদা বাঘ
কুপুইত : কুপুত্র
কুঁচড় :কোলের কাপড়ের আঁটা
কুড়চি বুদা : কুড়চি গাছের ঝোপ
কুঢ়হ্যার পাশ : কুড়ুলের ঘায়ে
কাঁটা লাটা বুদাড় : কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়
কুলুপ : তালা
কুড়্যাল চট্ : কুড়ুলের চোট

খ

খরহা : খরা
খরখস্যা, খেরখেসিয়া : খসখসে
খড়ায় : খোঁড়া
খল্যস : খোলস
খঁদড় : খোঁড়া, খন্দ
খঁসা : খোলা
খঁসল : বাঁধ
খঁড়ি : খুপরি ঘর, ছোট ঘর
খাঁখড়া : কাঁকড়া
খুখড়ি : মুরগী
খুঁজ্যায় : চুলকায়
খেঁখি : খেঁকশিয়াল
খাপরা : ভাতের হাঁড়িরঢাকনা
খালাখালি : শালপাতির থালাবাটি
খায়ঠে : খাচ্ছে
খেদান : তাড়ানো
খেড়হা : চুল
খেড়হা : খরগোশ
খেদেয় দিল : তাড়িয়ে দিল
খেনা : নাকি সুরে কথা বলা
খুড়রা : মোরগ
খুড়কি : মুরগী
খুঁঠহা : খুঁটি

গ

গড় : পা
গতর : দেহ
গরহ:গ্রহ
গড়ন : গঠন
গগা : উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করা
গটা : গোটা
গধড়া :
গইড়া, গইড়ান : গড়ানো
গঁদরা : গুজব
গঁদরা : বিরক্তিভাবে আপনমনে বকা
গঁড়রা : লাথি মারা
গঁসাএঁ : গোঁসাই
গরভিনা : গর্ভবতী
গরহন : গ্রহণ
গাড়া : গর্ত
গালমারা : মিথ্যে বড়াই করা
গাধেই : স্নান করা
গাড়িয়া : ছোট পুকুর
গাঁওলি : গ্রাম্য
গেলা : গেল, চলে গেল
গেধি, গিদান : মস্তিষ্ক
গেড়ে : হাঁস
গেড়িয়া : হাঁসের বিচরণভূমি, ডভা
গেঁগনা : নাকি সুরে কথা বলা
গিরহ : ঘর
গিরেক : গলে পড়ে
আঁখই গিরেক : চোখ থেকে জল পড়ে
গুড়কুম : গুড় রাখার পাত্র

গটায় : একটা

গগাঁয় : চেঁচিয়ে গোঁ গোঁ করে

গুড়্যেএ : ধামসা পিটিয়া বাজানো

গাড় হা, গাঢ়হা: পোতা

ঘ

ঘরন : তিন

ঘলটা : গড়াগড়ি দেওয়া

ঘরুআ : ঘরের মুরগীর

ঘইড় : পা

ঘইডা : স্বামী

ঘড়া, ঘোঁড়া : ঘোড়া

ঘার : ঘর

ঘারেক সাজ : ঘরের সাজসয্যা

ঘিসটাহা : নোংরা

ঘুননিবসা : ডিমে তা দেওয়ার সময় যে দশা

ঘুঁঘা : ঘোমটা

ঘেঁচা : গলা

ঘেঁচাকহার : গলার হার

চ

চর : চোর

চহখ : চোখ

চপা : খোসা

চড়া : ছিলা

চইঘর : চড়ব (গাছে চড়ব)

চপসঅ : চুপসে

চহর : একটু একটু ঠেলে সরানো

চঁছচরা : পাকস্থলী সংযোগ

চঁটরা : পাছা ঘসটে সরে যাওয়া

চঁহরা : ভারি বস্তুকে মাটির ওপরে ঠেলে সরানো

চঁয়া : মাছের আঁশ

চান্দ : চাঁদ

চাঁড়ে চাঁড়ে : দ্রুত চলা

চাভা : দাঁত দিয়া কামড়ানো

চাঁহু : তাকাও

চিন্হা : চেনা

চুনু : ছোট

চুইল : চুল

চুয়াড় : যুবক

চুটিয়া : ছুঁচা

চেঁঘি : গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ডালের

চেংনা : ফক্কড়

চোইখ : চোখ

চেঁথরা : ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো

চ্যার : চার

ছ

ছওয়া-পুতাত্রঁ : ছেলেপিলে

ছকার : কিশোরী, যুবতী

ছাতি : বুক

ছাল : চামড়া

ছা পোগা : ছেলেপিলেরা

ছাপু : লুকানো

ছাহেঁর : ছায়া

ছাঁচা : খড়ের চালা, চালা

ছেরকু : অকর্মণ্য, ভীতু

ছেঁউড় : মাতৃপিতৃহারা

ছিঁড়াটেনা : চেঁড়া কাপড়

ছ্যইল, গিঁদা ঘিন : নাচ বাজনার তাল

ছুঁছলতা : অশৌচ কাটানোর জন্য গোবর জলের ঝাঁট দেওয়া।

জ

জউরে : জোরে

জবরা : আবর্জনা

জড় : শিকড়

জড়া : জোড়া

জহড়া : জড়ো হওয়া

জমিন : জমি

জহাইর : ঢলবুরু ঠাকুর, মহামাই

জাগল : জাগ্রত

জাওয়া : অঙ্কুর

জাঅ : যায়

জাই : যাই

জাঙ : থাই

জাহইরি মাই, জাহির বুড়ি : দেবী

জানঘর : ওঝা, গুনিনের বাড়ি

জরকা : গরুর গলায় ঝুলিয়ে রাখা কাঠের টুকরো

জনম থান : জন্মস্থান, জন্মভূমি

জঁয়া, জঞা : পিঁপড়ে

জঁয় : জোঁক

জঁটা, জাংলা, জয়াঁ :

জাড়-ঠাণ্ডা

জিনগানিক : অস্তিত্ব

জাহানের ডরে : প্রাণের ভয়ে

জিউ : জিভ

জুনপুকি : জোনাকি

জেহেল : জেল

জুমড়া : পোাকাঠ

জুঁয়াল : জোয়াল

জুঁঠা : এঁটো

ঝ

ঝঁকরা : ঘরের পাল থেকে পড়া জল
ঝঁগমারি : ঝগমারি
ঝ্যালধুল : রাগ মেটানো
ঝিঁঝরা শাঁড়হা : বহুবর্ণের মোরগ
ঝাঁকড়া : ঝাড়
ঝাড়ি : ঝোপঝাড়
ঝিঁগা : ঝিঙ্গা

ট

টক্‌টক্, কাঁয়টক : প্রচণ্ড টক
টঁটা :
টকাটকি : ছেলেমেয়ে
টাঠি : বাঁশের দরজা
টিপলে : সেলাই করলে
টিহির, টিপিক :
টুলটুলি : উঁচু করে তোলা
টেরায় : আড়চোখে
টেকাবেক : আটকাবে
টেড়া, টেঁড়াক:
টেহনা : কনুই দিয়ে আঘাত করা

ঠ

ঠসা, ঠসরা : ভঙ্গুর
ঠড়কা, ঠারকা : গরু মোষের গলার কাষ্ঠখণ্ড
ঠার ভাষা : মানভূমের ভাষা
ঠিলি, ঠিলিয়া : ছোট কলসি
ঠঁড়হু আল : সামনে দাঁড়িয়ে
ঠাঁড়হা ঠাঁড়হা : জাড় জাড়
ঠিঠিল্লি : মন্দ কথা, নিন্দা কথা
ঠেং : পা
ঠেঠভাষা, ঠাঠ > ঠাড় > ঠার : খরভাষা
ঠেঠালি : সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানো
ঠুঁনে : গাছের ডগায়
ঠিনে : নিকটে, কাছে

ড

ডহর : রাস্তা
ডরকু : ভীতু
ডভা : পুকুর
ডাগর : যৌবনপ্রাপ্ত
ডাঙ্গুয়া : অবিবাহিতা
ডাকতাঁ : ডাকাডাকি করা
ডিবা, ডিবি, ডিবরি : লম্ফ
ডি ডহরে : রাস্তাঘাটে
ডি ডিহালি : গ্রামঘরে
ডেনিমা ঠাকরাইন : টুসুমণি

ডাইর : শাখা

ডালুয়া : গাছের ডালে বাস করে যে

ডাঁড়া : কোমর

ডাবল : চিনির কৌটা

ডিঁগা : একত্রে জড়ো করা

ডিঙর : তামাসা করে যে

ডুভি : বাটি

ডুভা : বড়বাটি

ঢ

ঢঙ, ঢং : রঙ্গ

ঢগা : লম্বা

ঢাড়হা : লাঠিপেটা করা আঘাত

ঢাঙি : লম্বাটে মহিলা

ঢিলা : আলগা

ঢিলা : উকুন

ঠিসা হাল্যা : অকারণে অপরকে যে করে

ঢেমনা : শয়তান

ত

তন : শরীর

তহরা : তোরা

তলা : চারাগাছের তলা

তিতলা-তেতো

তাড়, তাড়ে । খুঁড়ে, মাটির বড় গামলা

তাত্যল : গরম

তিরভূবন : ত্রিভূবন

ততলা : কথা জড়িয়ে যায় যার

তেলুআ, তেলতেলিআ : তেল দেওয়া অভ্যাস

তাখর : তাকে

তেভড়া : তবড়ানো

তঁই, তোয়েঁ, তেয়ঁ, তোহরে, তোহোর,
তু, তোহরি : তুই, তোর, তোকে, তোমাকে

থ

থকল, থক্কল : ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত

থকিত : ক্লান্ত

থরে : একবার

থল : স্থল

থিথায়ঁ : স্থির হয়ে

থথনা : চিবুক

থাহ : নাগাল

থেবড়া : দুমড়ানো

থাপড়ি : তালি

দ

দবড়া :দবড়ানো
দড়া : দড়ি
দড়াক : বাবইদড়ি
দমকা :উপয্যুপরি
দসর : দ্বিতীয় দিন
দমেত্রঁ : প্রচুর
দহরা : পুনরায়
দলকিছে : কেঁপে কেঁপে উঠছে
দরমরা : আধমরা
দিমাগ : মস্তিষ্ক
দিমু : দেবো
দুহি, দুধু, দুহি : দুধ দোওয়া
দুখা : ব্যথা
দুখাছে : ব্যথা করছে
দেনিমা : ডেনি মা ঠাকরাইন, টুসুমণি
দোইড়ছে : দৌড়াচ্ছে

ধ

ধব, ধবলি, ধবলা
ধলা : সাদা, ফরসা
ধইরে : ধরে
ধরতি : ধরণী
ধলাই : ধোয়া
ধমস :
ধাই: ধাত্রী
ধুমা, ধুসরা :
ধুনারি : ধুনা দেয় যে
ধোঁখা : ধোঁকা
ধঁচর : পদ্ধতি, রীতি, শৈলী

ন

নামঅ, নামহা : নিচু, নাবাল
নাখিক : নাকের
নাচেয়া : যে নাচে
নাঁয়খে : নেইকো
নি, নিহি :
নিজরি :
নিত :
নিদুয় :
নিডর : ভয়হীন
নিরন : গ্রীষ্মের ফসলহীন জমি
নিরধনিয়া : ধনহীন
নিকামিয়া : কর্মহীন
নিনদাক : নিন্দার
নিদ : ঘুম
নিদাল : ঘুমে পাওয়া
নেউতা : নিমন্ত্রণ

নেগাড়ি: ছাগল বা ভেড়ার নাদ

প

পরব : পর্ব

পইসা : পয়সা

পহড়া : পড়া

পহিল : প্রথম

পছড়ায় : কুলায় পাছড়ে, পরিস্কার করা

পরবোধ : প্রবোধ

পড়ামুঁহা : মুখপোড়া

পঁআঁর : আগড়া থেকে জাত

পওড়হা :

পড়ে :

পঁঠরু : বাচ্চা

পঁটা :মাছের কাঁটা

পাঁজড়া : পাঁজর

পাঁজা : নিরিক্ষণ করা

পিঁপড় : পিপুল

বা

পিঁড়া : বারান্দা, উঠান, বসার জায়গা

পিদঁড়ে :ঘাড়ের পেছনের দিক

পাইরা : কবুতর

পাইআ : পদ

পাহিকড়: ব্যঞ্জনবর্ণ

পাখুড় : পাখি

পালাইআঁ : পালায়

পাসরাইল :

পাতড়ি : পাতায় ঢাকা ঝোপঝাড়

পাইথের লাখান : পাখির মতো

পিথিম : পৃথিবী

পুরনা, পুন্না : পুরানো

পেলু :

পেছু : পিছনে

পথরি, পেথিয়া, পাই, পাইলা,

পুয়া : আসবাবপত্র

পুড়া : খবের দড়ি তৈরি ধান রাখার মরাই আধার

ফ

ফর : ফল

ফফ্সা, ফঁফরা : ফুসফুস

ফইরচর : পরিস্কার

ফড়িং : ফিন্গা

ফতেঙ্গা : পতাকা

ফাটিয়ে : ফুড়ে

ফিছায় : পাছায়

ফুফু : পিসি

ফুরুং : আগুনের ফুলকি

ফুঁকনল : আগুনে ফুঁ দেওয়ার চঙা

ফোঁফরা : ফাঁপা

ব

বইষ্টম : বোষ্টম, বৈষ্ণব

বউনি, বহনি : প্রথম বিক্রি

বতর : উপযুক্ত সময়

বদন : দেহ

বদা : পাঁঠা

বনহায় : তৈরি করে

বনুঅ : বুনো

বহু : বউ বা বধূ

বসমাতা, আঁবা : ধরণী

বলিচালি : বোলচাল, কথাবার্তা

বাড়ই, বাড়হই : বাড়ে

বাউ : বাতাস

বাখরা : সাড়া

বামহন: ব্রাহ্মণ

বাস : গন্ধ

বাটনা তেল : সরিষার তেল

বাজেয়া : যে বাজায়

বাদ্যইল :

বাবকাক :দঁড়কাক

হৃদধ্বনি

বাছইট, বাছুট : বাছাইয়ের পর

চাষ

পড়ে থাকা জিনিস

বাড়মাসিয়া : বারমাস্যা

বাহিরা মিতা : ছেঁক ছেঁক

বাখইল : বাখল

বুঢ়হা : বয়স্ক

বুঢ়হাবাবা, বুঢ়িমাই : দেব-দেবী

বুলিচালি : বোলচাল

বুলে :

বুদাক :

বিহন পুড়া : বীজধানের পুড়া

বিমন ভইলা : হতাশ হল

বিহায় : বিয়ের জন্য

বিনু : বিনা

বেরসাতি : বর্ষাকালে জাত

বেঘরুআ : ঘর নাই যার

বেনা :

বেথর : ব্যর্থ

বঙ্গা : বঙ্গ

বাঁঝি : বন্ধা

বাঁওয়া : বাম

বাঁচির কে ধুকপুকি : বেঁচে থাকার

বাঁহিচা, বাঁহচা : অন্যজনের গরু কাড়াকে

করতে নেওয়ার চুক্তি

বোল, বোলচাল : কথা বলা

বোয়াসিন : ছোট ভাইয়ের বউ

ভ

ভইর, ভউর : ভরপেট

ভউজি : বউদি

ভঁইস : মহিষ, কাড়া

ভখায়টে : ক্ষিদে পাচ্ছে

ভইকলা : ক্ষুধার্ত

কাঠ

ভব্থর : ভরপুর, প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ

ভখা ভাদরে : ক্ষুধিত ভাদ্রমাসে

ভাখি : ভাষা

ভাভ : ভাব

ভাদ্রিয়া : ভাদ্রমাসে জাত

ভালা : ভাল

ভাতুয়া : পেটভাতের মজুর

ভালে : দেখে

ভাঁড়ুয়া : ঠগ

ভাঁগি গেলাক : হতাশা হেলাক, হতাশ হল

ভাঁউঅর : ব্যাকরণ

ভিড়কা : ভয় পেয়ে দৌড়ানো

ভুজনা : শিশুর অন্নপ্রাসন

ভুটু : ভুট্টার ভাজা আফোটা বীজ

ভুরসি : শীতের দিনে পাত্রের ভুষি বা কুচা দিয়ে আগুন রাখার পাত্র

ভুখেল : বিরাট, প্রশস্থ

ভুগড়ার ঘর: ছিটেবেড়ার দেওয়াল দেওয়া ঘর

ভুজা : মুড়ি

ভেভায় : কাঁদে

ভেউলকাছে : ভেল্কি দেখাচ্ছে

ভেঁসুর : ভাসুর

ভুঁই : ভূমি

ম

মই : আমি

মইধ : মাঝ

মইচ্ছা : মরচে, শ্যাওলা

মরিচ: লঙ্কা

মধুমাছি : মৌমাছি

মসুর : মুসুর

মরদ : পুরুষ

মকর পরব : উৎসব

মসকুড়া, গুলটি : মাড়ি

মাঞ : মা

মাঁইভাখি : আমার ভাষা

মাস : মাংস

মাকড়া : মাকড়সা

মাড়ুয়া :

মাইচা : মেয়ের মতো স্বভাব যার

মাহরাই পরব :উৎসব

মিশেক নি : মিশেনা

মিছা : মিথ্যা

মহড়া : মড়া, মৃতদেহ
মসকা : হাতের তালুতে পেশাই
মলকা : প্রবল আনন্দে ছোটাছুটি
মল, মাগড়ি : অলঙ্কার
মাইত্রাঁ : মায়া
মানভূঁইআ : মানভূমের
মাহাতো, মাহাত, মাহত,
মহাত, মহান্ত, মহতো : মহৎ, বা মহান বা সৎ সাম্যবাদী অর্থে গ্রামের প্রধান
মাগজ : মাথা
মাগড়া : মাকড়সা
মেজুর, মেজুরা : ময়ূর
মাঁয়ামুঁহা : মেয়ে মুখ
মিঁচকা : শয়তান
মু, মুহ : মুখ
মুহেক : মুখের
মুড়েক : মাথার
মুড়া ঝাঁটা : ক্ষয়ে যাওয়া ছোট ঝাঁটা
মুদা : বন্ধ করা
মনু : কন্যাসন্তান
মুঠাঙ, রতি : মুঠো
মুইঠ : মুঠাধান ছড়িয়ে চাষের শুরু
মেরম : ছাগল

য

যদবা : যখন

র

রউদে : রোদে, রোদ্রে
রক্‌ত : রক্ত
রগদারগদি : তাড়া করা
রহস-সহন : সহ্য করে টিকে থাকা
রহিন : রোহিনী নক্ষত্র
রহলে : রইলে, থাকলে
রাইত : রাত্রি
রাখনী : রক্ষিতা
রুঠু, রগা : দুর্বল
রাঁঢ়ি : যার স্বামী মারা গেছে

ল

লক : লোক
লর : অশ্রু, জল
লচন : নয়ন
লিলজা : নির্লজ্জ
লিল : নীল
লেছাড়ি : ছাগল বা ভেড়ার নাদ

লদকা, লেদকা : অন্যের গায়ের উপর শরীরের ভর রাখে যে

লধা : লোধা উপজাতি

লড়বড়্যা : নড়বড়ে

লাই : নাভি

লাড়ু : নাড়ু

লাগর : নাগর, প্রেমিক

'ল' দিয়ে অতীতকাল বোঝায়।

লেখেন : মতন

লৈতন : নূতন

স

সগড়, সগড়ি : সকুড় (এঁটো সকুড়)

সড়ফ : রাস্তা

সরীল : শরীর

সলগিছে : জ্বলছে

সঁগেই : সঙ্গে, সঁগেই যান

সারি বা সারনা ধর্ম : সাধারণ ধর্ম

সাস : সাউড়ি

সাহড়ু : শালিপতি

সাঁইঝকাল : সন্ধ্যাকাল

সাঁচাকুথা : খাঁটি কথা

সিনিদেবী : জলের দেবী

সিধিআ : সিদ্ধ (ভাত)

সিথ্যান : মাথার বালিশ

সিরালয় : শেষ হয়ে গেছে

সুরুজ ঠাকুর : সূর্যদেবতা

সুজু, সুরুজ, সুরজ : সূর্য

সুপুইত : সুপুত্র

সাঁড়া : যে গাছে বা লতায় ফল ধরে না

সাঁগা, সাঁঘা : বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্নার দ্বিতীয় বিয়ে

সাঁঙলাউতে : সামলাতে

সেঁইতা : গোছগাছ করা

হ

হহিকড়, অড় আখর : স্বরবর্ণ

হর, হরদিন : প্রতিদিন, হররোজ, হরকাল

হরবুঢ়া : বাবা ভক্ত

হড় : মানুষ

হদকিছে : জ্বলছে

হয় আড়বেলা : দুপুর গড়িয়ে যায়

হিরদয়ে : হৃদয়ে

হড়মিতান :

হার : লাঙল

হামর : আমার

হাথেক : হাতের

হারুয়া : হালিয়া

হামরা : আমরা

হাপতা : সপ্তাহ

ক্রিয়াপদ

হায় নিকাশ : দীর্ঘকাল

হাঁসা : ফরসা

হাঁথি : হাতি

হিলগা : গলায় আটকে যাওয়া

হিঁসকুড়িয়া : হিংসুটে

হেরিণ (হেরণাটাঁইড় গ্রাম) :হরিণ

হেঁচড়ে-পেঁচড়ে : টানাহিঁচড়া করে

হেলি :

হেবকু :বোকা

হেলে, হেকি, হেলোউ, হেকেক : হিসেবে হ-এর ব্যবহার

হুলেড় (সাড়া) : শব্দগুলি

হুলকা : উঁকি মারা

সাহিত্য

কুড়মালি সাহিত্য

আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতির আলোচনায় কুড়মালি সাহিত্যের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালি ও কুড়মালিতে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তবে সাঁওতালি সাহিত্য এ বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ে আসছে। সাঁওতালদের বর্ণমালা 'অলচিকি' প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও, সাঁওতাল ভাষায় একাধিক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সাহিত্যিক যেমন আছেন তেমনই অনেক পণ্ডিত মানুষ দীর্ঘকাল থেকে সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে এসেছেন। এখন তো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অলচিকি লিপিতেই সাঁওতালি ভাষার শিক্ষাদান, পঠনপাঠন হয়ে আসছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুর্মি বা কুড়মি /মাহাতোরা এরকমই অগ্রবর্তী সম্প্রদায়। তবু তাঁদের নিজস্ব সর্বস্বীকৃত বর্ণমালা এখনও গড়ে উঠেনি। আমি আমার এবং অনুপ মাহাতোর তৈরি করা সফটওয়ারের ওপর নির্ভর করে মঙ্গল মাহাতোর কুড়মালি লিপিতে লেখা কয়েকটি প্রাথমিক পাঠদানের বই থেকে গ্রহণ করেছি। লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষা গবেষক ভরত মাহাতোর 'কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের আলোচনা থেকে সংগ্রহ করে বর্ণমালা সাজিয়েছি। কুড়মালি সাহিত্যে ঝুমুর একটি উন্নত সাহিত্য। কুড়মালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবাল্য গড়ে ওঠা কবি ভবতোষ শতপথী তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় কুড়মালি ভাষায় শক্তিশালী কাব্য রচনা করেছেন।

কবি ভবতোষ শতপথীর জন্ম ১৯৩৫-এর ৪মে টুলিবাড় গ্রামে। ঝাড়গ্রামে বসবাস করে তিনি কাব্যচর্চা করেন। তাঁর অসংখ্য কাব্যের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কান্তে', 'অরণ্যের কাব্য', 'শিরি চুনারাম মাঁহ্‌ত', 'ঢেমনা মঙ্গল', 'টুসু সঙ্গীত', 'ঝুম্যর', 'জুমঢ়া-তিতকি-ফুরুং', 'আলকুশি', 'ঝাড়খণ্ড চণ্ডালিকা', 'লোককবি ভবতোষ' ইত্যাদি।

কবি ব্রাহ্মণ ও জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও আবাল্য যাদের সঙ্গে থেকেছেন, যাদের সান্নিধ্য ও ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁরা কুর্মি বা কুড়মি সম্প্রদায়ের। তাঁর গ্রাম টুলিবাড়ের তাঁদের পরিবার ছাড়া আর সবাই মাহাতো, আদিবাসী। ফলে

ধামসা মাদলের ধ্বনি, গাজন, বাঁধনা, করম, টুসু, ভাদু, মকর, মেলা, মুরগীর লড়াই, হাঁড়িয়া খেয়ে সারা রাত নাচ গান আর ঝুমুর এসবের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে ওঠা কবির সব কাব্যেই প্রায় কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতির উ জ্জ্বল উপস্থিতি। ঝাড়গ্রামের প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাত তাঁর ঝুমুর গানে সুরারোপ করে গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ভবতোষ শতপথী ও বিজয় মাহাতর ঝুমুর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। উভয়েই আমৃত্যু কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ভবতোষ শতপথীর কুড়মালি সাহিত্যে অবদান অপরিসীম।

কুড়মালি ভাষায় অনেকেই কবিতা লিখেছেন। যেমন— বিন্‌নদ সিংহ, সিস্‌টিধর মাহাত, সিংদেও কাটিআর, ধনন্‌জয় মাহাতো, বানেশঅর মাহাত, আনন্দ খুঁটদার (মাহাত), জয়রাম মাহাতো, ভগবান দাস মাহাত, গোকুল মাহাত, মন্‌জু মাহাত, ভরত মাহাত। এই সব কবিদের কবিতা সংগ্রহ করে লোকসংস্কৃতি মানভূম পত্রিকার সম্পাদক ভরত মাহাতো একটি সংকলন প্রকাশ করেন ২০১৩-য় 'তিন ডঁররা ফুল' নামে। সম্পাদনায় (সঁজুঞতা)-য় তিনি লিখেছেন:

'বেশ কিছুদিন ধরিকে কুড়মালি ভাখিক চিমঅল গীত আর কবিতাক একটি সংকলন— পথি ফেরছাউ এক একটা লাল্‌সা করল রইহঅ। লালসাটা এতনা দিনেক পরে পুরন হেলেক। তিনটি ভিনু ভিনু রসেক গীত আর কবিতা মেশাইকে তিন ডঁররা ফুল পরিবেশন করলিঅ।... একর মইধে হামরা কুড়মালি ভাখিক আর ডঁররা দুয়েক চিন্‌হাপ পসরাও এক চেস্‌টা করলা হয়।

এহে পরসাওলটাঞ পড়হুআরা পঢ়িকে যদি কিছুটাও আনন্‌দঅ পাউঅত, হেলে হামর ঘামচুয়া ওলটা সার্‌থক হেতি।'

ভগবান দাস মাহাত তাঁর 'কুড়মালি ভাষা সন্ধান' গ্রন্থে কিছু ঝুমুর (ঝুমেইর) বরজুরাম দাস, গীরিশ মহান্ত, অনন্ত কেশরিআর, বিনন্দ, কৃত্তিবাস কর্মকার গোবিন্দলাল মাহাত প্রমুখের সংগ্রহ করেছেন। করম নাচের গীত, বাঁধনা পরবের গান— এসব সংগ্রহ করেছেন।

ভগবান দাস মাহাত-র আর দু-খানি উল্লেখযোগ্য কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার বই হল, 'পল্লীপ্রাঙ্গনের পড়চা' ২০১২ তে এবং 'কুড়মালি সংস্কৃতির রূপরেখা' ২০১৮ সালে প্রকাশিত। এছাড়া 'কুড়মালি ভাষার রূপরেখা'

নামেও একটি বই লিখেছেন। বইগুলি ভরত মাহাতো কর্তৃক প্রকাশিত। কিরীটী মাহাত 'ঝুমুর সঙ্গীত ও সাহিত্য' নামেও একটি উল্লেখযোগ্য কুড়মালি ভাষার সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী ও ঝুমুরে ঝাড়খণ্ড গণসংগ্রামের ইতিহাস-এর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তুলে ধরেন। বইটি পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত।

কবি মানিকলাল মাহাত ও কবি মঙ্গল মাহাত দুজনই ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা। এবং উভয়েই কুড়মালি লিপিতে কুড়মালি ভাষার চর্চা করে আসছেন। মানিকলাল মাহাত-র 'বুলান' কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয় ২০১৮-তে ঝাড়গ্রাম অরণ্যের কথা প্রকাশন থেকে।

মঙ্গল মাহাত-র 'কুড়মালি সার সগুন বিহা' (করম পরব) প্রথম বই। এরপর 'কুড়মালি চারিদিসা'- ২০১৬-তে প্রকাশিত। এতে প্রথম বর্ণমালার একটি রূপ প্রকাশ করেন। পরে মানিকলাল মাহাত-র বইয়ে প্রকাশিত বর্ণমালার সঙ্গে সামাঞ্জস্য রয়েছে। দুটো বই ঝাড়গ্রাম থেকেই প্রকাশিত। এছাড়া ভাষা শিক্ষা বিষয়ক মঙ্গল মাহাতর অন্যান্য বইগুলি হল 'কুড়মালি অ ব সুলুক পুঁথি'-২০১৭, 'কুড়মালি ভাখিচারি টুসু গিত- ২০১৮' কুড়মালি নেগাচারি কাঠি নাচেক গীত, ২০১৮-য় প্রকাশিত। 'কুড়মালি ভাখিচারি চিসঅই চিসা টুসু গিত' ২০২০-তে অনুপকুমার মাহাত-র তৈরি 'কুড়মালি কিপ্যাড সফটওয়ার' দ্বারা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ মাহাত 'জঙ্গলমহলের কুর্মিদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা ও বঞ্চনার এক অনালোচিত ইতিবৃত্ত' ২০২১-এ প্রকাশিত হয় মেদিনীপুরের কবিতিকা থেকে।

এখন তো কুড়মালি ভাষার সাহিত্য; ঝাড়খণ্পডের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠান-পাঠন শুরু হয়েছে। কুড়মালি জীবনচর্যা নিয়ে ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত-র গবেষণা বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। তাঁর জন্ম ২ জানুয়ারি, ১৯৩৭-এ বিহারের সিংভূম জেলার পাথরাঘাটী গ্রামে। পিতা - মহেন্দ্রনাথ মাহাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে অধ্যাপনার জীবন শুরু করেন। বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড ও তার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। 'ঝাড়খণ্ডের

লোকসাহিত্য' 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাবনা', ঝাড়খণ্ডী শব্দকোষ। তিনি ৩১টি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, 'শিলালিপি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

অনাদিনাথ মাহাত-র লেখা 'কুড়মালিভাষার উৎস ও বিকাশে ইতিহাস' ২০১৩। অনন্তঅ কেসরিআর-এর লেখা 'কুড়মালি ভাউঅর' ২০১৩ দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ও প্রচারের ক্ষেত্রে দুটি পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ১৯৮২-তে ঝালদা থেকে প্রকাশিত কুড়মালি পাক্ষিক পত্রিকা 'মানভূম এক্সপ্রেস', ১৯৮২ সালে প্রকাশিত প্রথম কুড়মালি পত্রিকা। সম্পাদনা করেন শ্রী ভগবান দাস মাহাত তাঁকে সহায়তা করে শ্রী অনন্তঅ কেসরিআর। শ্রী ভরত মাহাতো 'লোকসংস্কৃতি মানভূম' পত্রিকায় কুড়মালি সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষা ও লোকজীবন নিয়ে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৯৯১থেকে। এই দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ড, রাঁচী থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ কুড়মালি ভাষায় আঞ্চলিক সংবাদ, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ধাঁধা, রম্যরচনা প্রভৃতি প্রকাশ করতে শুরু করেন।

শ্রী লক্ষ্মীকান্ত মুতরুয়ার (বোকারো) সহ কুড়মালি ভাষা নিয়ে লিখেন শ্রীপদবাবু (ঝালদা), শ্রী আনন্দ খুঁটদার প্রমুখ। রাঁচি, ঝালদা, সিংভূমের বেশ কয়েকজন মহিলাও মানভূম এক্সপ্রেসে লিখতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে প্রবাবতী, শীলা, করুণাময়ী, রূপবালা, চারুবালা, মঞ্জুরাণী, সত্যবালা, সাবিত্রী, চন্দনা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের মধুমিতা বেতাল জঙ্গলিপি নামে কুড়মালি ভাষায় একটি উপন্যাস লিখেছেন, কলকাতা থেকে প্রাকাশিত। এছাড়া অখিল ভারতীয় কুড়মি মহাসভার সদস্য ভোলানাথ মাহাত নিরঞ্জন মাহাত কুড়মালি ভাষা পরিষদের সচিব এইচ এন সিং, (রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়), রাঁচির গণেশচন্দ্র মাহাতো, বোকারোর বঙ্কবিহারী মাহাত উক্ত পত্রিকায় লেখেন। সিংভূম, প্রমুখ কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারে প্রথম এগিয়ে আসেন। শ্রী অনন্তঅ কেসরিআর বাংলা লেখা ছেড়ে কুড়মালিতে কবিতা, গান, নাটক রচনা করতে শুরু করেন। শ্রী ভগবান দাস মাহাতর অনুপ্রেরণায় তিনি 'সপন কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ-র

পাঠতালিকায় স্থান পায়। তাঁর লেখা 'কুড়মালি ভাঁউঅর' (ব্যাকরণ), 'সাতুর' (গল্প সংকলন), 'পিয়াসী' ও 'সিঁদুর কাজর' প্রকাশিত হয়।

ঝুমুর

বৃহত্তর জঙ্গলমহলের লোকজীবনের একটি প্রধান বিনোদন হল ঝুমুর বা ঝুমেইর। সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে এই গান বাঁধেন এবং গাইতে শুরু করেন। এর মধ্যে দিয়েই আদিবাসী লোকজীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ধ্বনিত হয়ে উঠে। লোকমুখের সেই সব গানকে অনেক গবেষক লিখে সংগ্রহ করেন। কুড়মালি সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ এই ঝুমুরের মধ্যে রয়েছে। কুড়মালি ভাষায় ও আঞ্চলিক লোকজীবনের সুরে এসব গান গাওয়া হয়। ড. সুধীরকুমার করণ 'সীমান্ত বাংলার লোকযান'-এ, ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে, ড. বিনয় মাহাতো 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড' বইয়ে, ড. ধীরেন সাহা, ড. এন কে সিন্ধা, ড. বীণাপানি মহান্ত, গীরিশ মহান্ত, ভবতোষ শতপথী, বিজয় মাহাত, বরজুরাম দাস, অনন্তঅ কেসরিআর, বিনন্দ সিংহ, কৃত্তিবাস কর্মকার, গোবিন্দলাল মাহাত প্রমুখ অনেক ঝুমুর লেখেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ধানবাদ, সিংভূম, রাঁচি, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি জেলার জনজীবনের পরিচয় বহন করে এই ঝুমুর। এবার কয়েকটি ঝুমুর উল্লেখ করছি:

১। ভুসা কুটইতে নর, বিসরল হরিহর
অন্তকালে পন্থ ভুলি গেল,
রং-নর জনম বিধি কেহে দেল।।
বাঘ বাঘিনী সজে, সাপিনী দংশলি অঙ্গে,
বিষে সংসার ঘেরি লেল।।
রং-নর জনম বিধি কাহে দেল।।
মাঞ বাপ ধুরে গেল, দাসী পিয়ারি ভেল,
গুরু সে কপট চিত ভেল।।

রং-নর জনম বিধি কাহে দেল ।।

— বরজুরাম দাস

২. আগুন ফাগুন মাসা, বাঢ়ল মিলন আশা,

মন, মহি লেলা, ফুলকেরি বাসওয়া রে,

দিল ধরব কেসে,

মর পিয়া পরবাসিয়া রে ।। রং ।।

ইজর রাতিয়া, চমকে সারা দিশিয়া,

উদুকি উদুকি উঠে মনওয়া রে ।।

আমওয়াকের ডাইরে ডাইরে , ককিল গাত ও সুরে,

সেহ সুরে কুহরয়ে ছাতিয়া রে ।

মনওয়া না মানে মর, ঢরকি বহত লর,

সেহ লরে বহত গিরিশিয়া রে ।।

— গীরিশ মহান্ত

৩. শিখ শিখর নাগপুর, আধাআধি খড়গপুর

ঢল নাগড়া একে সগেঁ বাজে,

রং-জাগে হেইক ঝুমেইর দেশ, কুরুম দেশ জাগে ।।

গীত ঝুমেইর গাঁও এঁ গাঁও এঁ

জড়ুয়াহি ঠাঁও এঁ ঠাঁও এঁ,

উজাড় হেল বনপাহাড়, ঘুরিকে পুঁগে ।।

সত্য বৃহস্পতি মেলা, হুড়াক আরোফুল মেলা,

উবকি উঠে বাঁচেক চাঁইড়ে, লহু যে অগেঁ ।।

সবন্নখা রাঢু কাঁচু, রিঝে অনন্ত আঝুবাঝু,

কাঁসাই দামুদরে লহর, একে রেগ লাগে ।।

— অনন্ত কেরসরিআর

৪. আওল বসন্ত, থল নাহি চিত,
সজনীরে, কতেক সহবই দুখজালা।
ধদকি পলাশ, ফুটল উলাস,
সজনীরে বন করিকে যে আলা।
অলি ধাঁয়ে ধাঁয়ে, মধু খাঞে খাঞে,
সজনীরে, আনন্দে করি খেলা।
সেহ দেখি শুনি, ভাবেই অভাগিনী,
সজনীরে, বিনন্দ ত্যজলঞ কালা।।
— বিনন্দ

৫. ঝিমিক্ ঝিমিক্ জলে, চিটামাটি গলে,
ছইলকে গেলি গ, পিছলে গেলি গ,
পড়ে হলি গ তকে ভাল্যে ভাল্যে।রং।
ছলক্ ছলক্ চাইলে, আড়ে আড়ে ভাইলে
নয়ন বানে গ বিঁধেছে হিয়ায়,
পাগল হলি গ ও তোর মাথা বাঁধাটায়।
কৃত্তিবাস বলে, আমি সকল গেলি ভুল্যে,
বলগে ইসারায়, কি হবে উপায়,
টান্যে নিল গ ও তোর মুচকি হাঁসিটায়।।
— কৃত্তিবাস কর্মকার

৬. হামকে ছাড়িকে কেসে, রহে হেলিস পরদেশে
আইজ কেসে পিয়া করলে খেয়াল,
রং-অহো, তর-পিরিতি হামর হেলি যে কাল।।
যেদিনলে তঞ গেলে চলি, সুখেক বাতি নিভি গেলি,
রাতি জাগি আঁখি হেই গেলি যে লাল।
নেদী বহই নয়না লরে,

বিঁধলি কুসুম শরে;
নৌতন জোয়ানি বেসামাল।।
গোবিন্দা কহত ঠানি, তবে কি ভুলিব ধনি,
তর লাগি মর মনোয়া কাঙাল।
— গোবিন্দলাল মাহাত।

কুড়মালি কবিতা

মানভূমেক ধঁধোউরা
—সিস্‌টিধর সিংদেও কাটিআর

লিক্ করলেক্ পাকিস্থান
বাঙালেক হেলেইন টান।
মানভূমকে করে হেথিক বাঁঙাল— হো।
কমিশন আওতাক মাঘ মাসে, বাইসে তেইশে,
দলে দলে চালা সবাই দিহ্‌না ঘুসে,
মানভূম তঅ্ রহেইক বিহারে,
মানভূম তঅ আহেইক বিহারে হো।

মানভূমেক চাইল্ চলন, দেখে আওতাক্ কমিশন;
তরা রহিহানা ভাই মটরেক আশে।.
মানভূমেক সীমানা লেইকে, ঠিক করতা তিন লকে;
হামরা কহব অখর পাসে।।
মানভূমেক মাঞ ভাখি, খুট্টা কুড়মালি হেকি;
বাঁগ্‌লা কহিআনা কাকরঅ পাসে।।
সভে কারাই দেহাক্ মনে জর, করিহানা ভাই কাকউ ডর;
তাক্ হারাইহানা নিজেক দশে।।
সভে কাই চালা কঅহত, নিতঅ এবার মরবে করব;

বাঁচি রঅহব কেথিকর আশে ।।
পুরুইলায়ঁ রহঅত্ রাইত, বিহান্ হেলেই রাঁচী জাত;
সভে রহিই কা সড়পেক পাশে ।।
বিনদা বনেক দইড় ধূপ, তহরা সবাই আইহা তুপ;
দেবেন মাহাত আহে তহর পাশে ।।
নিজেক্ ধন লুটি লেলে, ছাড়হান না জীউ গেলে;
তেঞ সিস্‌টিধর আউহল তহর পাশে ।।

মানভূম আহেইক্ বিহারে, আর রহেইক্ বিহারে হো।
হামরা জড় সড় রহব কিন করে,
আর কাকাঅর ডরে হো।
মানভূম আহেইক বিহারে,
আর রহেইক্ বিহারে হো ?
হামরা আইহ্ এতেক লক্, কাকরঅ আহেক এসন হক্;
হামরাকে লেলে জাতাক্ জরে হো ?
মানভূমেক মাটিক রঁগ, মিসক্‌নি আন্ দেশক সঁগ,
তবে হামরা মেসব কিনা করে হো ?
যখন রহেক্ ব্রিটিশ রাজ, সেটা ভাভি দেখা আইজ;
নাম রাখলেক্ ছটনাগপুরে হো!
মানভূমেক গাছ গাছড়া, আর জতেক গাঢ়া ঢঢ়া;
দেখলেই তপারবে পরিখ করে হো!
মানভূমেক আহেক ধন, লহা তাঁবা কইলা রতঅন্;
সেসব হামর, দেখলে আহাত চরে হো!
হামর আহি আয়াঁ হক্, খায় এক বেরাঞ কতেক লক্;
হামর ধন আহি মাটিক তরে হো!
হামর দেশেক ধন খায়কে, চলহত্ সব মক্‌মকাইকে;
আসাম পাঠাও হঅত হামরাকে কাম করে হো;

রামপদ সিং, মাধাই দাস, এরা কিছু দেলা আশ;
হামরাও ত শিখলে আইহ মরে হো;
(লকেক্ মুহে শুনিখন লিখল)

কুড়মি দঁহঁগিক্ বাচিক্

— বানেশঅর মাহাত

দহ বিড়লে আইকে হিঁয়াঁ, বসলা জাঁহাঁ তাঁহাঁ
গো মরি হায় হায়!
সবর নাখা-খড়কাই-কাঁসাই-কয়েল-কিনারে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর- সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

রাঢু-কাঁচু, করকারি, গুআই, দামদাক-কুমারী
গো মরি হায় হায়!
ভেড়া, বাম্হনি-দারকেশঅর-বরাকর ধারে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়ংাতি শিখরে।।
গো মরি হায় হায়!
জনা, দলমা, জয়চন্টী, পাঁচেত, সেঁউয়াঁতি খড় হরে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

ময়ূরভনজ্, সুরজগড়, বাধাবন আর কেঁউনঝর,
গো মরি হায় হায়!
দেখা, রাজা মহারাজা গড় হেক্ তরে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

জারগো পাহাড় ঢলবুরু, সিঁকরা, কপিলাক ধারে;
গো মরি হায় হায়!
আসান মেদিনীপুরে গেলা তাকর পরে।

ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।
তবে, জনাবন, বিজুবন, বাধাবন, আর দঁড়বন,
গো মরি হায় হায়!
অরুণবন লেইকে, এহে পন্‌চবটিক্ ধারে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

হামরাকে ভঁটে লাই, বুইধগরে বুইধ বনায়;
গো মরি হায় হায়!
বাঁটলা হামরাকে, বাংলা-উড়িষ্যা-বিহারে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

রাজনীতিক বড় চাইলে, ভঁটাইহানা কন করলে;
গো মরি হায় হায়!
লড়হি পাটিয়ঁ ছেঁছা লাইহঅ্ কহেই বানেশঅ্রে;
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়াঁতি শিখরে।।

নর জনম-১

— বিনন্দ সিংহ

তবে, জাঁহাঁ পাহাড় কঁচ, বানসা, বাঁড়ীবুরু চন্‌চল অঝেইদা, ভুষা কুটইতে নর,
বিসরলঁ হরি হর
অন্‌ত কালে পন্‌থ ভুলি গেল!
হায়রে নর জনম বিধি কাহে দেল।।

মাঞ-বাপ ধুরে গেল, দাসী পিয়ারী হেল
গুরু সেত, কপট চিত ভেল!
হায়রে নর জনম বিধি কাহে দেল।।

বাঘ-বাঘিনী সঁগে, সঁপিনী দঁশল অঁগে
বিষে সংসার ঘেরি লেল!
হায়রে নর জনম্ বিধি কাহে দেল।।

বিনন্দ সিংহ ভাসে, সিনধু তরবঁ কৈসে
হেলকে নৌকা ডুবি গেল!
হায়রে নর জনম বিধি কাহে দেল।।

মনস্তাপ

— জয়রাম মাহাতো

মনে উঠেই কতেক ভাব, রহি গেলি মনস্তাপ
মরি অহোরে, উজানে বহয় নেদিয়া;
অচেতনে রহলঁ মঁই মদে মাতিয়া—।
কেসেকে পার হেম, দেখি কাঁপত মর হিয়া।।

জীবন যইবন ধন, আশাতে রহলি মা।
মরি অহোরে কাকে কহম দুখেকর বাতিআ;
এ হেন যইবন ধন, গেলিরে চলিয়া।
কেসেকে পার হেম, দেখি কাঁপত মর হিয়া।

জয়রামেক ভবে আসা, দুঠিন করল বাসা;
মরি অহোরে, আচকে দিন গেলিরে চলিয়া;
মানিক রতন ধন, না পাউআঁ খজিয়া;
কেসেকে পার হেম, দেখি কাঁপত মর হিয়া।

মাঞ ভাখি

— ভগবান দাস মাহাত

মাঞ ভাখি কনে শিখাও লোও ?
এহে ধরাধামে জেয়ঁ আন্ লোও ।
ধরায়ঁ, জনম-করম্ ভূয়ঁ পানি;
মানুষ জিনগানীকে ধরম্ করম্ জানি ।
করম করা তহরা সবাই মিলি;
ধরাধামে সুখে রহ বেহে মিলি ঝুলি ।
ভাখিক মান আর জাতিক সন্মান
বুঝিহাক্, মাঞবাপেক্ সমান ।
হিঁয়া ঠায়ঁ তকে কনে দে লোও;
বিস্‌রিহাক্ না জীউ গেলেও
মানুষেক চিন্‌হাপ-মাঞ ভাখি;
মাঞ ভাখি, মাঞেক সমান হেকি ।

ধন্য ভাই সত্য কিঙ্কর

— মজনু মাহাত

লাঠি খেলায়ঁ মানভূম জেলাক উপর;
বিনা যুইধে হেরাওলে জীবন তর ?
ধন্য! ধন্য ভাই তঞ সত্যকিঙ্কর!
কাকরঅ হাথেদতুন কাঠি;
কাকারঅ হাথে তেলেক বাটি ।
যশ কীরতি সংসারে রাখলে তর!
ধন্য ধন্য ভাই তঞ সত্যকিঙ্কর!
কাঁহাঁ রণভূমি তর; কাঁহা ঠেঁগালাঠি তর;
রাঁচী সড়পে গিরি রহলোও দেহ তর ।
ভাভি মজনুআ কাঁদেয় অসট্ পহর;
ধন্য! ধন্য ভাই তয়ঁ সত্যকিঙ্কর ।

মানভূমেক জান কেহনি

— ভরত মাহাত

জান কেহনি, শুন কেহনি শুনা;
বন-বাদাড়ে হাথিক আনাগনা।

ভাই, ঝুমের গানে আর টুসু গানে;
হিঁয়াঁ, করম গানে আর ভাদু গানে।
উছল-কুদল নাচে-ডেগে নেখেক মানা;
বিহাগীতেক ষোলশ গু নেক কথাশুনা।

এহে সবর নাখালে দারকেসর;
রূপাই-কাঁসই আর দামুদর—
টুংগরি টিলহা রুগড়ি ঘুটু আয়ঁ;
টাঁইড় টিকির আর গাড়া ঢড়হাঁয়।
মানভূয়ঁ এক আঁখে বহেক লর;
ভাভেস, ধিয়া পুতা কাঁহাঁ কাকর।

খেলি কুদি বাড়লয়ঁ বেজায়ঁ আদরে;
মাঞ গো, তর সেঁওয়াতি শিখরে।
হিয়াঁ আহেক সরগেকর সুখ রে;
বনমালী, মানভূম মধুমতী ভাইরে।

খায়-পিকে ময়ঁ হিঁয়াঁ মাঞ গঅ;
আইজ আঁগড়ে-ঝাঁগড়ে বাড়লঅঁ।
হামর চির দুঃখিনী মায়ঁ গঅ;
তাওএ তকে হামে নি চিন্হল।
তর ফুলে ফরে ঝররল বাগান;

সিরকাল রাঞ্চ, করলেথিক ডাহান।।

অঝোইদা শিকার

—ভরত মাহাতো

আসল বাপেক্ বেটা হেবে।
অঝোইদা শিকারে যাবে।।
শিকারে বিকার করিস না।
কাঁহাঁ জাহিস রে খাটিসুতোও না।
শুনিলে মরবিদিয়াক বাজনা।
শিকারে বিকার করিস না।

বইশাখ পুরনিমাঅক্ চাঁদে
বছরে লাগেক অঝেইদা শিকার।
সেদিন শিকারিরা হিঁদে হুঁদে।
ঘেরি লেথিক্ গটা অঝোদা পাহাড়।।
কোন কোন বছরে লাগে-নি শিকার।
কোন বছরে হেন সভেকর মুখ ভার।।
দিনে-দিনে সামাজিক এহে চারিটা এখর।
আইজ বাঁচায় রাখাটা হেলেন ভার।।

শিরি চুনারাম মাঁহ্ত

ভবতোষ শতপথী

হামার নাম শিরি চুনারাম মাঁহ্ত হুজ্যুর!
সাকিম গড়্গড়্যা নালা
থানা বর্হা ডাঁ গা
জেলাটা ত ভুল্যেঁই গেছি— মনে হছে নাঁয়।
— টুকু জউরে বইল্বে হুজ্যুর!

একবারেই কালা নাঁয়, তবে টুকু চ্যার্ আড় কালা বঠি।
ঈশ্বর অধর মাঁহ্ত, কবেই মরয়েঁ ভূত হয়েঁ গেছে।

মঁড়ল ঘরের উ জমিনটা—
হামার ঠাকুদ্দায় ভাগে চাষ কইর্থঅ।
বাপের ঠিনে শুন্যেঁয়েছি—
যে বছর জরিপ আল্যঅ—
মঁড়লরা বেসত বিনতি কর‍্যাঁয়েঁ বইল্ল—
দে্ অধ্রা, জরুপের আপিসার আমিন আল্যে—
বলবিস্ যে, মড়ল বাবুরাই চাষ্ খচ্চা দেই
হামি মুনিষের লেখেন্ খাঠ্যাঁয়েঁ চাষ-আবাদ কর‍্যেঁ দি!
জমিনের চাষটা বাবুদেরই বঠে!
হামি দেখাশুনা করি, চাষ বেহেরার লেখেন।

ই দলের উ দলের লিডারগিলা, ফাঁকে ঝুঁক্যে আস্যাঁয়ে—
বাপ্‌কে ফুস্‌ফুসানি মন্তর দিথঅ।
বাপ বইল্থঅ, ধুর হে! পরের বাপ্‌কে বাপ্ বইল্ব নাঁয়!
হামি যেখন গাঁয়ের তেঁত্যল্তলের পাটশালায় পঢ়হি হুজ্যুর!
—'কর''খল''ঘট''জল'।
ভাগচাষের কথা নাঁয় বুইঝ্তে পারি
গিয়ান হতে বুইঝ্লি, হামার বাপ্ লকটা বেদম বকা ছিল,
করম আর ধরম কইরতে কইরতেই—
নায়ঁ খাতে পাঁয় মর‍্যাঁয়েঁ গেল।
মইর্ল ত সির‍্যাঁলঅ, হামার কাঁধে জয়াঁল্ পইড়্লঅ।
মঁড়ল ঘরে হামকে ডাক্যেয়ঁ লিয়ে বইল্লঅ—
"কিরে চুনা! বাপ ঠাকুদ্দার লেখেন উজা রাস্তায় চলবিস্ ত ?"
হামি না জবাপি হয়্যেঁ গেলহি।

খানিকক্ষণ থিথায়ঁ, সুস্তি জবাপ দিল্‌হি—
তুমরা ঠিক থাইক্‌লে, হামঅ ঠিক রহিব।
লকে-জনে শুনছি, হালে -হালে একটা লৈতন অ্যান্‌ হয়্যেঁছে—
মালিকের একভাগ, আর চাষির তিনভাগ।
ঐ হিঁসাবেই হামঅ ভাগ ধান দিব ই-বছর লে।
মঁড়ল বাবু রাগে গর্‌গরায়ঁ, ভুয়া বিলায়টার লেখেন বাহ্‌র্‌য়্যায় গেল।
যাতে যাতে বল্যেঁয় গেল, ঠিক আছে— দেখা হবেক আদালতে!
তুঁই কত চাল্লাক— আর হামরা কত ?
পেটে দানা নায়ঁ, ফিছায় টেনা নাঁয়, তভুঅ ফি বছর
অদের ভাগ ধান মাপ্যেঁয় দিয়েঁছি হুজ্যুর্‌!
এক পাইঅ বাকি রাখি নায়ঁ।
হাম্‌কে রসিদঅ দেয় নায়ঁ, খাতায় উআশিলঅ করে নাঁয়!
শুধা মিছায় চারবছরের বাকি দেখায়—
লালাশি ঠুক্যেয় দিয়েছে কোউটে ।
কাজ কাম কাম্‌হ্যাঁয় কর্‌য়েঁ হ্যাজ্‌রান্‌ দিছি—
আর হাইরান হছি ডেড়-দুবছর হল্যঅ।
হামার উকিল-মুক্তিয়ার কেউ নেঁয় হুজ্যুর!
কুথা পাব দু-তিন কুড়ি টাকা, যে উকিল মুক্তিয়ার লাগাব ?
খাঁঠি বিচার কর হুজ্যুর! লেজ্জ্য বিচার কর!!
টুকু জউরে বইল্‌বে হুজ্যুর্‌!
আঘুয়েই বল্যেঁয়েছি ন, টুকু আড়্‌কালা বঠি!
কি বইল্‌ছ হুজ্যুর ? জমিনটা ছাড়হাঁয় লিতে পাইরবেক নাঁয়!
মিছা মামলা ডিস্‌মিস্‌ হয়েঁ গেল ?
তবে গলা ঝাড়্যেঁয় একবার দমে জউরে চেঁচায়ঁলি হুজ্যুর—
শিরি চুনারাম মাঁহ্‌তর জিৎ কার!!

বাপ-ঠাকুদ্দায় কী জ্যুতের নামটা রাখেঁয় ছিল—

চুনা পুঁঠিরে সঁঘে রামন নাম মেশায়ঁ চু-না-রা-ম!
শালা, গায়ের লে, ন তার নামের লে—
অ্যাঁশটানি বাস উইঠ্‌ছে— গটা জীবন!!

রুঁজি-পুঁজি সউব্‌ সির‍্যায়ঁ, ছিল্‌হি "চুনারাম"— হয়্যেঁ গেলহি চুনা!
ই দুন্যায়াটায় দেইখ্‌ছি—
মাঁয়্যার মালিক মরদ আর মরদের মালিক টাকা।
টাকা-পইসা, জাইগা-জমিন নায়ঁ থাইক্‌লে—
বাঁচ্যে থাকাটা কি হায়রান হে বোহনাই!
শালা, গাঁয়ে-ঘরের জ্যাত কুটুম গিলাঅ নায়ঁ ভালে!
কুকুর-বিলায়ের লেখেন 'হাড়ি' 'হাড়ি' কর‍্যেয়েঁ খেদ্যেঁ দেই।

কুসমীর কথাই বল্‌ন!
এক ছটর লে উঠা-বসা, ঘুঁষা-পেষা কর‍্যেয়েঁ ভালবাসা হল্যায়!
দেখ্যেঁয়েঁ দেখ্যেঁয়ঁ বাঢ়ালি, রাইতে কতবার স্বোপনালি,
তার কি ন বিহা হয়েঁ গেল—
ঢের ধুরে— বড়লোকের ঘরে।
কুস্‌মীর বাপে বইল্‌ল নায়ঁ নাঁয়, চুনার সঁঘে বিটির বিহা দিব নাঁয়
উয়ার চাল-চুলহা কিছুই নাঁয়।
বিটি ছানাটাকে লদীর জলের ভাসায়ঁ দিতে নায়ঁ পাইর্‌বঅ!
ঠিকেই ত বল্যেয়েঁছে কুস্‌মীর বাপে—
হামর খুখ্‌ঢ়া-বাঁধা দড়িঅ নাঁয়।
পরের বিটিকে খাওয়াব-পর্‌হাব কি ?
সেদিন লে চাথির ভিথ্‌রে আগুন হদ্‌কিছে ত হদ্‌কিছেই।
চইখে কি আর তরহা থানায়ঁ পাবিস ?
মনের আঁগুন মনেই সল্‌গিছে।
রাইতে টুকু সুস্তি ঘুমাতে পারি নায়ঁ!

দেশে কি মশার উৎপাত্ হয়্যেঁছে হে!

শালা, মশায় কি আর মানুষ বাছে ?
রগা-ভগা যেমনই হোক্— ফাঁক পালে রক্ত চুয্যেঁয়েঁ লিয়েঁ—
পেট ঢিল্ কঁর‍্যেয়েঁ— ভন্‌ভনায়ঁ উড়্যেঁয়েঁ পালায়
মশা মাইরতে নিজের গালে
নিজেই চাপড়াঁয় হচ্ছি।

ঢের দিন বাদে—
একদিন আচ্‌কা দেখা হয়্যেঁ গেল কুস্‌মীর সঁঘে
শ্বশুর ঘর লে— বাপের ঘর অস্যেঁয়েঁছে!
ক'লে একটা পদ্মফুল্যের লেখেন বেটা ছানা।
হামার দিগে আঙ্গ্যুল্ বাঢ়ায়ঁ দিছে—
হায় দেখ্‌ন রে— বাবু, তর্ আর একটা মামা!
ভালবাসা ভেস্তায়ঁ গেলে—
যার বাপ হবার কথা— সে মামা হয়েঁ যায়।
হায়রে কপাল! হামি ঘড়ায় কি চইঘব ?
ঘড়া হামার পিঠেই চঘ্যেঁয়ে বইস্‌লঅ।
শিল নঢ়হায় কপালটাকে ঠুক্যেঁয়ে ফাটায়ঁ দিতে মন হয়।
আর, রাগে গরগরইয়েঁ— গলা ফাটায়ঁ ভগবানকে ডাক্‌তে
মন করে— অ ভগা—ভগা হে—
কন্ ঠিনে লুকালি, হামার ডরে ?
লাগ্যাল্ পালে একেই চটে অদরায়ঁ দিব—
ভইখল্যা ঠকান্ মাথাটা।

পাহাড় ধারেরগাঁ

ভবতোষ শতপথী

পাহাড় ধারের গাঁ। হামার লদী পারের গাঁ!
বিজলি বাতি নাঁয় রাস্তায়, পিচে পুড়ে নায়ঁ পা।
কাঁটা-লাটা-বুদার-বাদাড়, ঠুঠ্‌হা গাছের গড়াঁ
ভাঙা লদীর মস্ত কাতা, রাজা বাঁধের আড়া!

ভখা গরিব গাঁ! হায়রে, বকা লকের ছা!
দিন মাঁস্যা পুয়াতি, রউদে হেঁসফেঁসাছে মা!
আতড়া ধারে গেঁড়ি ঘুঘ্‌লি পাত্‌রি ধারের পাত
খালা-খালি টিপ্‌লে হাটে বিক্‌লে হবেক ভাত।

সুখের লাগর লহর পহর গা হিইছে রসের গান
গরিব মানুষ উড়াছে তুঁষ কুথায় পাবিস্‌ ধান ?
চিকন-চাকন ছুঁঘ্যন-মঁঘ্যন্ টক্‌টক্যা যৈবন

মানুষ চুষ্যেঞ মানুষ বাঁচে, কার যে কোনটা দেশ।
বুইঝ্‌তে লারি গগায়ঁ মরি! কবে হবেক শেষ ? ?

লিপি

ভ. কুড়মালি লিপি

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা কার্যে এগিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল, আদিবাসীদের মধ্যে অগ্রসর সম্প্রদায় সাঁওতালরা তাঁদের নিজস্ব বর্ণমালা অলচিকি গড়ে তুলেছেন। কুর্মি বা কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত মাহাত সম্প্রদায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে অনেকখানি এগিয়ে। এই ভাষায় অনেক উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিক, গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এঁদেরও যদি কোনো লিপিমালা গড়ে উঠত, তবে তা এই সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করে তুল। ১৫এপ্রিল ২০১৮-য় ঝাড়গ্রাম বলাকা মঞ্চে ভবতোষ শতপথী স্মারক বক্তৃতায় কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে লিপির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভব করি। পরদিন সকালে প্রিয় বন্ধু ড. ফটিকচাঁদ ঘোষ আমাকে ঝাড়গ্রাম বাস স্ট্যান্ডে মঙ্গল মাহাতর কাছে নিয়ে যান, তিনি 'কুড়মালি অ ব আই সুলুক পুঁথি' তাঁর নিজের রচনা আমার হাতে তুলে দেন। সেখানে তাঁরা কুড়মালি লিপি ব্যবহার করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা তিনজন দীর্ঘ সময় এ বিষয়ে আলোচনা করি। পরবর্তীকালে আরও একাধিকবার এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনা ঘটে। মঙ্গল মাহাত তাঁর 'কুড়মালি চারিদিসা' পুস্তকে এবং মানিকলাল মাহাত তাঁর 'বুলান' বইয়ে অনুপকুমার মাহাতর সফটওয়ারে তৈরি লিপির সহায়তায় এই কুড়মালি লিপি প্রস্তুত করেছেন। মঙ্গল মাহাতর একাধিক বই কুড়মালি লিপিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'লোকসংস্কৃতি মানভূম' পত্রিকার সম্পাদক ও 'কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের লেখক ভরত মাহাতোর সঙ্গে বাঁকুড়ায় তাঁর কাটজুড়িডাঙ্গা উত্তরায়ণ পল্লীতে কুড়মালি ভাষা ও লিপি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আমার ধারণা হয়েছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর লিপি লিখন আজও আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। আমাদের আর্যভাষাসহ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির লিপি দেবনাগরী সিদ্ধমাত্রিকা লিপির উত্তরাধিকার।কিন্তু অনর্য লিপিগুলির মধ্যে কোথাও হয়তো সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার বা প্রকৃতলিপির উত্তর সরণ রয়েছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সৈন্ধব লিপির পাঠোদ্ধার অসংখ্য দেশী

বিদেশী পণ্ডিত আজও করতে পারেনি।[১] কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত পাথরের শিলমোহরের লিপি থেকে (যেমন ইন্দোর জাদুঘরে রক্ষিত মহালক্ষী মুদ্রাঙ্কিত তাম্রশাসক বা বাঁকুড়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শূরভূম বেহারীনাথ পাহাড়ের পাথরলিপি) কোথাও একটা সংযোগের কল্পনা করা যায়।[২] এসব থেকেই বংভীলিপি বা আসুরীয় লিপির সঙ্গে সৈন্ধবী লিপি থেকে আদিম অধিবাসীদের লিপিভাবনা গড়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত লিপিভাবার সুন্দর ছাপ রয়েছে কুড়মালি লিপিতে। তবে এখনও অখণ্ডতা স্বীকৃত হবে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এ বিষয়ে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কুড়মালি ভাষা অনেক আগামীর দিকে এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোস্বামী, প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়ো, শীলমোহর অধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ. ১১১-১৩৭

২. শ্রী হরিদাস পালিত, রাঢ়ি বাংলার আলপনা চিত্র, ১৩৪১, পৃ. ৩৪২-৩৪৯

(চিসই চিনহাঁপ)

অ A	ব B	আই I
আ AA	গ G'	ত TA'
এ A	স s	ন N
E ই	K ক	R র
ম M	হ H	ড় RH
উ U	দ D	ল L
O ও	IN ইঞ	NG অঙ
CH চ	J ঝ	P প
on অং	Ay অয়	D অড
T ট	HH জড়হ	A' শিগ্ত্র
	১S	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

কড়ুহালা [illegible] বর্নমালা

হহিকড়ু/অড় আখড় Vowel

[illegible]

পাহিকড়ু/জড়ু আখড় Consonant

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আদা [illegible] আই আইলা [illegible]

কাটাইলা [illegible] হড়ুহইড়া [illegible]

জুলা [illegible] মাদইলা [illegible]

তিন্ [illegible] ধাতিন্ [illegible]

ডর [illegible] গাড়ু [illegible] জাত [illegible] ধান [illegible]

গ্রন্থতালিকা

১) কিরীটী মাহাতো, ঝুমুর: সঙ্গীত ও সাহিত্য, পুরুলিয়া, ১৯৯২
২) কুড়মালি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভরত মাহাতোর সাক্ষাৎকার, সূর্যদেশ পত্রিকা, ২০২১
৩) দীপঙ্কর ঘোষ, বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,২০০৪
৪) দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, জঙ্গলমহলের কুর্মিদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা ও বঞ্চনার এক অনালোচিত ইতিবৃত্ত, কবিতিকা, ২০২১
৫) ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৯
৬) পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন
৭) ফটিক চাঁদ ঘোষ, জঙ্গলমহলের লোকসমাজ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, কবিতিকা, ২০২২
৮) বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, প্রতিমা প্রকাশন, ১৯৭৮
৯) বিনোদশঙ্কর দাস,জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণবিদ্রোহ, গণমিত্র, ২০১১
১০) ভবতোষ শতপথী, ভবতোষ শতকোটি রচনা সমগ্র, বর্ণমালা, ২০১৮
১১) ভরত মাহাতো, কুর্মালি ভাষা প্রসঙ্গে, লোকসংস্কৃতি মানভূম, ২০২১
১২) ভরত মাহাতো, তিন ডঁড়রা ফুল, লোকসংস্কৃতি মানভূম, ২০১৩
১৩) ভগবান দাস মাহাত, পল্লী প্রাঙ্গণের পরচা লোকসংস্কৃতি মানভূম,২০১২
১৪) ভগবান দাস মাহাত, কুড়মালি ভাষা সন্ধান, লোকসংস্কৃতি মানভূম, ২০১৩
১৫) ভগবান দাস মাহাত,কুরমালি সংস্কৃতির রূপরেখা, লোকসংস্কৃতি মানভূম,২০১৮
১৬) মঙগল মাহাত, কুড়মালি চারিদিসা, ঝাড়গেরাম, ২০১৬
১৭) মঙগল মাহাত, কুড়মালি অ ড আই সুলুক পুঁথি, ঐ, ২০১৭
১৮) মঙগল মাহাত কুড়মালি নেগাচারি কাঠি নাচের গিত, ঐ, ২০১৮
১৯) মঙগল মাহাত, কুড়মালি ভাখিচারি টুসু গিত, ঐ, ২০১৮
২০) মঙগল মাহাত, কুড়মালি সার সেগুন বিহা, ঐ,
২২) মানিকলাল মাহাত, বুলান, অরণ্যের কথা, ২০১৮
২৩) শ্রী কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জো-দড়ো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১

২৪) শ্রীহরিদাস পালিত,রাঢ়ী বাংলার আলিপনা চিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৫ চৈত্র, ১৩৪১
২৫) সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, ১৯
২৬) সুধীর কুমার করণ, বাংলার লোকযান,
২৮) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা, রূপা, ১৩৫৬
২৯) সুস্নাত জানা, ভাষাও ভাষ্য, জঙ্গলমহলের কথা, সম্পাদনা - তাপস মাইতি, উপত্যকা, ২০১৮

ইংরেজি তথ্যপঞ্জি:

- Ascoli F. D., Early Revenue History of Bengal 1812.
- A. K. Jamieson, survey and settlement report of Midnapore,
- A.K. Jamieson, Operation in the District of Midnapore, 2911-17, 1918.G.A. Griarson, linguistic survey of India, V-5 1903
- H.Coupland, Bengal District Gazettirs, Midnapore, Manbhum, Bankura, 1910,1911.
- H.H.Resley, The Ethnographic Survey of India 1892
- H.H.Resley,The Tribes and Caste of Bengal,1891
- James George Freezer, The Golden Bough,V-11,1906-15.
- Ministry of Parliamentary Affairs - Government of India, Annual Report- 1917 to 18 appendix (5) status of private member s Bills, dated 01.01.2017- 05.01.2018
- Oxford English Dictionary 2007.
- Report of the Standing Committee on social justice and empowerment lok sabha, Secretariat Ministry of Tribal Affairs, 2011 and 12.
- Times of India, November 25, 2004 News Caption, Cabinet recommended inclusion of "Kurmis"in the ST Lists.

সুস্নাত জানা

কবি ও প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক

জন্ম: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ পূর্ব মেদিনীপুরের বরগোদা গ্রামে। গ্রামের স্কুল, তমলুক কলেজ পেরিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর।ইউ. জি. সি. ফেলোশিপ নিয়ে য়েটস্ ও ব্রাউনিং এর অনুষঙ্গ সহযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের



কবিতা বিষয়ে পিএইচ.ডি.। তমলুক থানার বিভাষা নিয়ে পোস্ট ডক্টোরাল। কবিতা, উপন্যাস, গদ্য মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮টি। আসন্ন প্রকাশ "শ্রেষ্ঠ কবিতা"। একাধিক প্রথম শ্রেণির দৈনিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য বাংলা বিভাগে পাঠদান। এখন মেদিনীপুর কলেজ ও মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা। সম্পাদিত পত্রিকা সূর্যদেশ। আন্তর্জাতিক রূপসী বাংলা পুরস্কার, পি. ও. বোডিং সম্মান প্রভৃতি সম্মাননা পেয়েছেন।

সুস্নাত জানা'র উল্লেখযোগ্য বই

কাব্যগ্রন্থ: আর এক বিভঙ্গের নৈঃশব্দ্যে, বৃষ্টির নূপুর, ধানমন্ডির মেয়ে, বুদ্ধপিটক, পোস্ট মডার্নিয়া, অকল্পকথা, সেই আলো রজতাভ ।

প্রবন্ধ: জীবনানন্দ: আলা বলয়ের দিকে, আধুনিক বাংলা কবিতাপাঠ, প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই, পোস্টমডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, গীতাঞ্জলি সৃজনের অন্তর্গত সত্তায়, উত্তর আধুনিক সাহিত্য পাঠ, মেদিনীপুরের লোকভাষা, মালীবুড়োর সংগ্রহশালা ও গবেষণাগার, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি।

সম্পাদিত পত্রিকা: সূর্যদেশ



arindambhowmik@gmail.com
www.midnapore.in
09886128516 / 8918606989



